দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

শাসকদলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণের কাজ অব্যাহত— পৃঃ ২৩

এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'অন্তর্ঘাত' করেও গদি বাঁচাতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী — পৃঃ ১১

৭৮ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ১৬ মার্চ, ২০২৬।। ১ চৈত্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৬ মার্চ - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

তিন দশক আগে বাতিল হয়ে যাওয়া ধরনা-ধর্মঘট-ঘেরাও ধোঁকায় মানুষ ভুলবে ? 'ব্যাকগিয়ার' □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ভোটের ঘুষ ডিস্তাত! ধোঁকাদাত্রীযু দিদি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্টরা আজ সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্গিক □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ৮

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাধাসৃষ্টির ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে তৃণমূলের □ কৌটিল্য □ ১০

এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'অন্তর্ঘাত' করেও গদি বাঁচাতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী □ ড. বিনয়ভূষণ দাশ □ ১১

এসআইআর-এর পূর্বাভাস—ভোট ডাকাতির জারিজুরি শেষ □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১৩

বার্ধক্যের শৃঙ্খলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি : শিল্পহীনতার খেসারত কি তবে এক বিশাল বৃদ্ধাশ্রম? □ সোমনাথ গোস্বামী □ ১৬

হাসিনার প্রশাসনেই ঘাপটি মেরে বসেছিল মীরজাফররা □ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী □ ১৮

শাসকদলের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্য ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণের চেষ্টা অব্যাহত কমিশনের □ আনন্দ মোহন দাস □ ২৩

হিন্দু সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনাকে মনে করানোর উৎসব হিন্দু নববর্ষ— বর্ষপ্রতিপদ □ পিন্টু সান্যাল □ ৩১

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং বঙ্গপ্রদেশ □ অধ্যাপক বাপ্পা মহন্ত □ ৩৪

'অসাংবিধানিক নয়' : ছত্তিশগড় হাইকোর্টের 'যাজকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার হোর্ডিঙের বৈধতা বহাল সুপ্রিমকোর্টের' □ ৩৭

মাওমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে মাওবাদী দৌরাত্ম্যের তেজ নিভে যাবার মুখে □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৪৩

আমার সঙ্ঘজীবনের ইতিকথা □ অবনীভূষণ মণ্ডল □ ৪৬

মমতার 'দুধেল গাই'দের আস্ফালনে কি এবার হিন্দুদের বারোটা বাজবে? □ বিপ্লব বিকাশ □ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০ □ খেলা : ৩৮ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে ২৩ মার্চ ২০২৬

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৩ মার্চ ২০২৬

রামময় ভারত

শ্রীরামচন্দ্র ভারতবর্ষের আত্মা। ভারতবাসীর শ্বাসপ্রশ্বাসে পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র বিরাজমান। প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের শাসনপ্রণালী, নীতিনিষ্ঠা এবং কর্তব্যপরায়ণতা যুগে যুগে 'রামরাজত্ব' নামেই প্রশংসিত। এই ভারতাত্মাকে ভারতবাসীর মন থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা কম হয়নি। বৈদেশিক বিধর্মী আক্রমণকারীরা শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। রামভক্তদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অযোধ্যায় পুনর্নির্মিত হয়েছে রামজন্মভূমি মন্দির। সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামের মন্দির যেমন রয়েছে, বঙ্গজীবনেও রামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তো শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও হয়ে ওঠে রামময়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারতীয় জীবনধারায় শ্রীরামের প্রভাব বিষয়ক আলোচনা থাকবে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সাংবিধানিক কার্যে বাধা সৃষ্টি সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নহে

বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়া জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এক্রিয়ারভুক্ত বিষয়। ইহা সাধারণত নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোনো নির্বাচনের পূর্বে সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি সাংবিধানিক ও আইনি প্রক্রিয়াও বটে। যাহার মাধ্যমে ভোটার তালিকা নির্ভুল ও স্বচ্ছ করা হইয়া থাকে। এটি ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪, ৩২৬তম অনুচ্ছেদের এবং ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২১তম ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহার মাধ্যমেই যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এবং অযোগ্য, অবৈধ, ভুয়া, মৃত ও স্থানান্তরিতদের বাতিল করা হইয়া থাকে। ইহার পূর্বে দেশে বহুবার এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে। কোথাও কোনো রাজ্য সরকার ইহার বিরোধিতা অথবা বাধা সৃষ্টি করে নাই। গত বৎসর প্রথমে বিহার রাজ্যে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হইবার পর খসড়া তালিকায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল হইয়াছিল। বিয়োজন পরবর্তী পর্যায়ে নাম সংযোজন পূর্বক শেষে তাহা ৪৭ লক্ষে দাঁড়ায়। নির্বাচন কমিশনের দাবি, যাহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে তাহারা সকলেই মৃত নহে, তাহার সিংহভাগই অবৈধ। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১১টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করিবার নির্দেশিকা জারি করিয়াছিল নির্বাচন কমিশন। বিহারের পরিণতি পর্যালোচনা করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই হুঙ্কার ছাড়িয়াছিলেন তিনি কোনোভাবেই তাঁহার রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করিতে দিবেন না। তাঁহার এই বিরোধিতার কারণ হইল, অবৈধ ভোটারের দৌলতেই তিনি তো শাসন ক্ষমতায় টিকিয়া রহিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় বহু পূর্ব হইতেই বহু সংখ্যায় অবৈধ ভোটার রহিয়াছে। ইহারা সকলেই বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্বের বাম সরকারও এই অনুপ্রবেশকারীদের জাল নথি তৈরি করাইয়া তাহাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য। বিরোধী নেত্রী থাকিবার সময় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি লোকসভার স্পিকারের টেবিলে অবৈধ ভোটারদের নাম সংবলিত তালিকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই তিনিই এখন রাজ্য ও রাজ্যবাসীর নিরাপত্তার কথা না ভাবিয়া যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করিতেছেন। তাহার জন্য তিনি সুপ্রিম কোর্টে মামলা পর্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছে, এসআইআর হইবেই এবং তাহাতে কোনোপ্রকার বাধা প্রদান করা যাইবে না। বরং এই কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য রাজ্য সরকারকে সর্বপ্রকারে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন যে, নানাভাবে এমনকী অন্তর্ঘাত করিয়াও এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিয়া চলিতেছেন।

তাহা সত্ত্বেও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল হইয়াছে এবং আরও প্রায় ৬০ লক্ষাধিক নাম তথ্যগত ত্রুটির কারণে বিবেচনাধীন চিহ্নিত হইয়াছে। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করিয়া মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসিয়াছেন। উল্লেখ করিবার মতো বিষয় হইল, কেরলম্ ও তামিলনাড়ুর ন্যায় অবিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ কিন্তু এসআইআর লইয়া কমিশনের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হন নাই। পশ্চিমবঙ্গবাসীর লজ্জার বিষয় যে, সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করিয়া বলিতে হইতেছে, তথ্যগত ত্রুটির বিষয়টি বিচার ব্যবস্থার আধিকারিকগণ সম্পন্ন করিবেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, যে ৬০ লক্ষ নাম বাতিল হইয়াছে তাহার অধিকাংশই মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার। যে দুইটি জেলায় জনসংখ্যার ভারসাম্য বিঘ্নিত হইয়াছে। রাজ্যের শাসক দল তথা মুখ্যমন্ত্রীর এত বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন যে ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণের কার্য অব্যাহত রাখিয়াছে তাহার জন্য তাহারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। পরিশুদ্ধ ভোটার তালিকা একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি, এই সত্যটি যাহারা অনুধাবন করিতে পারেন না, তাহাদের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার থাকিলে সেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তাহা রাজ্যবাসীকেই অনুধাবন করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।। (গীতা-২।৫৮)

কচ্ছপ যেমন আপন অঙ্গসমূহ সংহরণ করে নেয়, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় হতে ইন্দ্রিয়দের সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে জানবে।

তিন দশক আগে বাতিল হয়ে যাওয়া ধরনা-ধর্মঘট-ঘেরাও ধোঁকায় মানুষ ভুলবে?

‘ব্যাকগিয়ার’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ভোট চুরি অব্যাহত রাখতে কলকাতায় ধর্মতলা চত্বরে গত ৬ মার্চ থেকে ধরনায় বসেছেন তৃণমূলনেত্রী। ধরনা জল মাপার যন্ত্র। দেখে নিতে চান জল কতটা গভীর ডোবার আশঙ্কা রয়েছে? রাজনৈতিক কারণে শেষ কবে ধরনা দিয়েছেন বলতে পারবেন না। ভাইপো সাংসদ বলেছিলেন লক্ষ মানুষ নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবেন। সে গুড়েবালি বুঝে এখন দু'জনেই ব্যাকগিয়ার দিয়েছেন। চোরকে বাঁচাতে মাঝরাতে ধরনা দিয়েছিলেন।

অনেকে বলেন তিনি নাকি সব কিছুর উৎস মুখ পরোক্ষে নিজের আর প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য পুলিশের প্রশংসা করতে এক বিধায়ককে দিয়ে কুৎসিত চলচ্চিত্র বানিয়েছেন। এক (১টি) ভোটে হলেও বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে জিতবেন বলে হাস্যকর দাবি করেছেন। ১৯৫৬ ভোটে হেরে নন্দীগ্রাম থেকে পালিয়ে আসেন। কানাঘুঁষো চলছে এবার ভবানীপুর থেকেও পালানোর তাল করছেন। মনে হয় না তা হবে। তাই এক ভোটে জিতলেও চলবে আওয়াজ তুলেছেন। ২০২১-এর ভোটে ১০টির ভিতর ৭টিতে হেরে যান।

তিন দশক আগের মতোই থেকে গিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। ১৯৯৬ সালে রবীন্দ্র সরোবরের মুক্ত মঞ্চ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বলছিলেন ‘সাহস থাকলে তাড়াক’। কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী তার চালাকি ধরে ফেলেছিলেন। কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ হাতে সেদিনের প্রদেশ যুব কংগ্রেস নেত্রী সে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন। তার দু'বছর পর তৃণমূল জন্মগ্রহণ করে। গোয়েন্দা কাহিনিকার স্যার আর্থার কোনান ডয়েল শার্লক হোমস চরিত্র সৃষ্টি করে বলেছিলেন যদি এই চতুর আর ধূর্ত বুদ্ধি অপরাধের কাজে ব্যবহার হয় সে অপরাধীকে কোনোদিন ধরা যাবে না। সময়ের তালে তা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। দক্ষিণ কলকাতার এক তৃণমূল বিধায়ক এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যদি ২০ হাজারের ব্যবধানের বদলে তিনি ১ হাজারে জেতেন সেটাই তাঁর প্রাপ্তি। এতটাই সঙ্কটে আজ তৃণমূল!

পশ্চিমবঙ্গের ভোটারের কাছে আগামী ১৮ মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওই দিন সুপ্রিম আদালতে তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে ১৭টি ফৌজদারি মামলার শুনানি হওয়ার কথা। ততদিনে ভোট ঘোষণা হয়ে যেতেও পারে। আর পুলিশও চলে আসবে নির্বাচন কমিশনের আওতায়। রাজ্যপালও বদল হয়েছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে যদি কোনো কড়া পদক্ষেপ নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আর তা হলে রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একমাত্র প্রতিকারের রাস্তা। তদন্তকারী সংস্থার দীর্ঘসূত্রিতা আর অলসতার কারণে পলাতক পুলিশ কর্তা রাজীব কুমারকে ছাড় দেয় সুপ্রিম আদালত। মামলা খারিজ হয়ে যায়। তাতে অনেকটাই হতাশ রাজ্যের সৃজনশীল ভোটার। সেই রাজীব কুমার এখন দেশের আইনসভার সদস্য। পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে এর চাইতে লজ্জার আর কী হতে পারে। যার থাকার কথা গরাদের পিছনে তিনি বসবেন আইনসভার গদিতে! তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাছে গোদের উপর বিষফোঁড়া অভয়া কাণ্ড। প্রায় দু'বছর পরেও সেই হত্যাকাণ্ড আর নিকৃষ্ট অপরাধের চক্রীদের চরম পরিণতির কথা শোনাতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এরপর তৃণমূলনেত্রীর বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা না হলে বলতেই হবে রাজ্যের শাসকের একচেটিয়া অপরাধের অধিকারের কারণ যেমন কিছু ভোটার, তেমনই কেন্দ্রীয় সংস্থা। তারাই তাঁকে পরিস্থিতির অপব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার কোনো জায়গা নেই। রাজ্যের ছয় থেকে সাড়ে ছয় কোটি ভোটারের মনে সাহস, আস্থা আর আত্মবিশ্বাস যোগাতে যা করার প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন তাই করে চলেছে। তাই ভোট চুরি থেকে রেহাই পাওয়া তৃণমুলের পক্ষে এবার প্রায় অসম্ভব। এসআইআর প্রক্রিয়ায় সারা দেশে প্রায় ১২ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত ভোটার বাদ পড়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী রাজ্য। সংখ্যাটা বেশি হলে অবাক হওয়ার নয়। তিন দশকের বাতিল হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ কায়দাকে ব্যবহার করে তৃণমূল সুপ্রিমো মাঠে নেমেছেন। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ফারাক করতে না পারাটা একধরনের বিকার। বুদ্ধি লোপ পাওয়ারও নজির। ধর্মঘটহীন রাজ্য বানিয়ে নিজেই যিনি ধরনায় বসেন তাঁর বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটেছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ফারাক করতে না পারাটা একধরনের বিকার। বুদ্ধি লোপ পাওয়ারও নজির। ধর্মঘটহীন রাজ্য বানিয়ে নিজেই যিনি ধরনায় বসেন তাঁর বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটেছে।

ভোটের ঘুষ ডিস্তাত!

ধোঁকাদাত্রীষু দিদি,

আপনি মহানুভব। ভোটের আগে রাজ্যের সরকারি স্কুলে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিকের পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে ১২টি অতিরিক্ত ডিম অথবা মরসুমি ফল দেওয়া হবে। এই ডিম ও ফল খাওয়াতে হবে ৩১ মার্চের মধ্যে। আপনার এই নির্দেশের পরে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। তার পরে শিক্ষা দফতরের সেই বিজ্ঞপ্তিটা দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ।

তবে কী দিদি, ভোটের ফল ভালো করতেই এই ডিম আর ফলে ভরসা। রাজ্যে মাদ্রাসা তৈরির জন্য ৫,৭১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বাজেটে। কিন্তু শিক্ষাখাতে ততটা বরাদ্দ হয়নি। তবে ডিমের জন্য যে প্রায় ৭৮ কোটি টাকা খরচ হবে দিদি, সেটাও তো বাজেট বরাদ্দ নয়। এটা তো আসলে ডিমের তেলে ডিম ভাজা।

আমি যা জানি, মিড-ডে মিলের জন্য বেশিরভাগ টাকাটাই দেয় কেন্দ্র। পিএম পোষণ প্রকল্পের সেই টাকা দেওয়া হয় ডিম, ফল, মাংস এসব কেনার জন্য। চাল, ডাল আলাদা করে দেয়। সঙ্গে সব রাজ্যই বাড়তি টাকা দেয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে সেই টাকাটা খুবই কম কিন্তু দিদি। ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, দিল্লি ও কেরালার মতো রাজ্যে মিড-ডে মিলের অধীনে সকালের জলখাবারের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে মূলত আলু সয়াবিনের তরকারি আর ভাতই দেওয়া হয়। সবজির দম কম হলে একটু আধটু মেলে। অনেক সময়ে আলুসেদ্ধ ফ্যানা ভাতও দেওয়া হয়।

সপ্তাহে দুদিন ডিম। সেটাও দাম কম থাকলে।

আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারি না দিদি। গরমের ছুটি, বর্ষার ছুটি, পুজোর ছুটি বাড়িয়ে দিলে পড়ুয়াদের খাবারের জন্য খরচও কমে যায়। কিন্তু কেন্দ্র তো বাড়তি ছুটির হিসেব না করেই টাকা দেয়। এখন সেই টাকা কিছুটা বেঁচে গেছে। শুনলাম নাকি ইচ্ছা করেই বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ভোটের মুখে ভোটার বাবা-মায়েদের খুশি করতে মোট ১২ দিন সবাইকে একটা করে ডিম খাওয়ানো হবে। বাহ্ দিদি বাহ্।

১২ দিনে ডিম খাওয়াতে এক-এক দিনের জন্য পড়ুয়া-পিছু বরাদ্দ আট টাকা। এই অতিরিক্ত ডিম বা ফল প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১৫ জন পড়ুয়াকে দিতে হবে। তাদের অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যই এই ব্যবস্থা বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু পুষ্টি তো সারা বছরই দরকার দিদি। আচমকা ভোটের আগে পুষ্টির কথা ভাবলেন কেন!

পড়ুয়াদের অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যই এই অতিরিক্ত বরাদ্দ বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু পুষ্টি তো সারা বছরই দরকার দিদি। আচমকা ভোটের আগে পুষ্টির কথা ভাবলেন কেন!

ইতিহাস বলছে, পর পর তিনবার ভোটের আগেই বাড়ল স্কুলপড়ুয়াদের খাবারের বরাদ্দ— ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। মনে আছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চার মাস মুরগির মাংস আর ফলের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৩৭১ কোটি টাকা। আর এবারে বিধানসভা ভোটের আগে বরাদ্দ ৭৭.৯৪ কোটি টাকা। সে টাকাও বাড়তি বরাদ্দ নয়, মিড-ডে মিলের বরাদ্দ থেকে বেঁচে যাওয়া টাকা। মাছের তেলে মাছ ভাজার যথার্থ উদাহরণ।

দেখুন, গ্রীষ্মের অতিরিক্ত ছুটির জন্য গত বছর মে মাসে ১৭ দিন মিড-ডে মিল দেওয়া হয়নি। ওই দিনগুলির জন্য মাথাপিছু প্রাথমিকে ১০৮.৪৬ এবং উচ্চ প্রাথমিকে ১৭২.৮৯ টাকা বরাদ্দ ছিল। যা খরচ হয়নি। এখন বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে পড়ুয়াপিছু ৯৬ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও হিসাব মতো প্রাথমিকে ছাত্র-পিছু ১২.৪৬ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৭৬.৮৯ টাকা থেকে যাওয়ার কথা। এই টাকা কোথায় গেল দিদি?

তাছাড়াও দিদি, রাজ্যে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এক কোটি ১১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী নথিভুক্ত। কিন্তু আপনার সরকারের নির্দেশে অতিরিক্ত ডিম ও ফলের বরাদ্দ ধরা হয়েছে মোট ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য। মানে মেনে নিলে ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলছুট। কেন্দ্র এর আগেই এ নিয়ে চিঠি দিয়েছিল। জবাব দিয়েছেন দিদি! তার মানে কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে ছোটদেরও ধোঁকা দওয়া হচ্ছে! পারলে এক দিন ধোঁকার ডালনা দিন না, সত্যিকারের ধোঁকা কেন? □

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্টরা আজ সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্গিক

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের আগে-পরে সবসময়ই কমিউনিস্টরা কথায়-গল্পে-লেখায় দাবি করে যে, তারা নাকি সৎ। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরাও তার ব্যতিক্রম নয়। এ রাজ্যে এখন ভীষণ অস্থির সময়, যেদিকে তাকানো যায় সেদিকটাই পচে গিয়েছে। কোথাও ঘুণ ধরেছে অনেক ভিতরে। কোথাও ছাল চামড়া উঠে কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। কমিউনিস্টরা তার বিরোধিতা করছে। যদিও কেন্দ্র বিরোধিতায় তারা অতিসক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে সুর চড়ালেও দিল্লিতে তারা সেই তৃণমূলের সঙ্গেই শামিল রয়েছে ইন্ডিজোটে। অবশ্যই গঠনমূলক সরকার বিরোধিতা স্বাস্থ্যকর গণতন্ত্রের লক্ষণ। প্রশ্নটা এখানে ভিন্ন। যেহেতু তারা পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল ক্ষমতা ভোগ করে আজ ক্ষমতায় নেই, সেহেতু তাদের এই মুহূর্তে সৎ সাজাটা বেশ সহজ। মানুষ অনেক কিছুই মনে রাখে না সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এর থেকেও বড়ো কথা, যারা এই মুহূর্তে শিক্ষিত সচেতন ভোটার তারা তো ২৫ বছর আগের চাপা পরে থাকা কমিউনিস্ট কুকীর্তি সম্বন্ধে পুরোটা ওয়াকিবহাল নয়। ফলে, রাজ্যে যখন ভীষণ দুর্নীতি, তখন নীতিবাক্য আউড়িয়ে কিছুটা রাজনৈতিক জমি ফিরে পেতে মরিয়া কমিউনিস্টরা। তারা দারুণ সৎ, নীতিবান, কর্মীবান্ধব, শিল্পবান্ধব, সংস্কৃতি-বান্ধব— কিছু সংবাদমাধ্যমের দ্বারা ইদানীং এই ধরনের ন্যারেটিভ প্রচারিত হচ্ছে। চলছে রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তির এক জোর টানাপোড়েন। এসব করে কি আর কমিউনিস্টদের 'সৎ' প্রমাণ করা যাবে? যদি কমিউনিস্টরা এতটাই সৎ ও প্রান্তিক মানুষ-দরদি হতো তাহলে বাংলাদেশের মতো দেশ, যা শ্রমনির্ভর, কৃষিনির্ভর একটি দেশ, সেখানে কেন তারা মুছে গেল? এই প্রশ্ন কেন এপারের কমিউনিস্টরা করেন না? এখনোতো এই প্রশ্নটা আসছে না তাদের মধ্যে থেকে। ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই অজুহাত দেয় কমিউনিস্টরা। আরও মজার কথা, আওয়ামি লিগের হাতে বাংলাদেশের ক্ষমতা যাওয়ার পর সেদেশের কমিউনিস্টরা নিজেদের জাতীয় স্তরের সমাজতান্ত্রিক হিসেবে ঘোষণা করে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক' বিপ্লবের বায়বীয় প্রস্তাব এনে দলীয় কাগজে, মুখের কথার কচকচানিতেই তার স্বাদ মেটায়। এই কারণেই বাংলাদেশের উদাহরণ দেওয়া হলো, এতে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় কমিউনিস্টরা তাদের স্থান পাকা করতে পারত, কারণ তারা বলে যে, তারা হলো বঞ্চিতদের পক্ষে। নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান পাকা করা তো দূরস্থান, তাদের যতটুকু রাজনৈতিক জমি বাংলাদেশে ছিল, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে সেটুকু থেকেও তারা বিচ্যুত হলো। বাংলাদেশ এবং ভারতের অঙ্গরাজ্য— পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে তাদের বিলুপ্তির কারণ হলো— আত্মম্ভরিতা, সততার মুখোশ পরে থাকা, দলীয় ও ব্যক্তিগত অহমিকা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অনুধাবন না করা, নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত না করা, জনমনের স্পন্দন না বোঝা। অনুকূল প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক সুযোগ ও সম্ভাবনা বাংলাদেশেও ছিল, যার সদ্ব্যবহার করতে পারলে কমিউনিস্টরা বাংলাদেশে শক্ত করতে পারত নিজেদের পায়ের তলার মাটি; কিন্তু নিজেদের ভণ্ডামির জন্য তারা আজ বিলুপ্তির পথে। এপারেও বিলুপ্তির কারণ একই। কমিউনিস্টরা তাদের ভাষণে বা লিখিত রাজনৈতিক দলিলে কখনো তাদের ভুল স্বীকার করে না। অতীতের অপরাধ স্বীকার করে কখনো তারা বলে না যে, সেদিনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ন্যারেটিভটা ভুল ছিল। তারা বিলুপ্তপ্রায় তবুও রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য, বিস্ফোরক কথাবার্তা এবং অবশ্যই সততার তত্ত্ব পাঠের পুরনো অভ্যাস তাদের যায়নি। আজ যদি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি না করত, যদি তারা কেবলমাত্রই ভোট চুরি করত কিন্তু সরকারি স্তরে চুরি-দুর্নীতি তেমন একটা করত না, তখন কিন্তু কমিউনিস্টরা 'সততা'র ভাষণ দিয়ে নিজেদের ক্লিন ইমেজ তুলে ধরার এতটা প্রশস্ত পথ পেত না। তারা মানুষকে এই ধারণার অনুবর্তী করতে চাইছে যে, তাদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ, মানুষের জন্য তারা ছিল, আছে, থাকবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো— কমরেড, তোমাদের বুদ্ধিভিত্তিক অসততা আর কতদিন চলবে? লিবারাল রাইটসের চক্করে আর কতদিন মানুষের, বিশেষ করে ছাত্র ও যুবসমাজের মগজ ধোলাই চলবে?

'বুদ্ধিভিত্তিক অসততা'র জোরে তারা এখনও টিকে আছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কারণ ছেলে-মেয়েরা মেধাবী হলেও বাস্তব জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাহীন। ফলে ভুল ন্যারেটিভ মাথায় ঢুকিয়ে তাদের দলে টানা যায়। কলেজ ক্যাম্পাস টপকিয়ে যেই না বাস্তবের মাটিতে তারা পা রাখল তখন মনের মধ্যে কিছুটা কমিউনিস্ট আবেগ থেকে গেলেও ভোট পড়ে প্রয়োজনীয় দলের প্রতীকে। কমিউনিস্ট পরিভাষায় 'দলিত নেতা' কমরেড রামচন্দ্র বাবাজী মোরের জীবন সংগ্রামের আদর্শকে সামনে রাখলে আদর্শচ্যুত হওয়াও সহজ এবং আদর্শহীনতাটা ধরা পরার সম্ভাবনাও কম। আজকে যত প্রকার রাজনৈতিক অন্যায়, সামাজিক অনিয়ম হচ্ছে তার বিরোধিতা করাই যায়, কারণ তা গণতান্ত্রিক। কিন্তু বিরোধিতা করার নৈতিক জোর কতটা আছে এই কমিউনিস্টদের? তারা নিজেরাই তো সবরকম অন্যায়-অত্যাচার-অনিয়ম সব স্তরে অসংখ্যবার সংঘটিত করে বসে আছে। কমিউনিস্টরা যখনই কোনো অনিয়মের প্রতিবাদ করে তখন ভণ্ড কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগটাই আরও জোরালোভাবে করে থাকে সাধারণ মানুষ। দার্শনিক রুশোর মতবাদ ধার করে কমিউনিস্টরা চায় একটা 'General will' তৈরি করতে। ওরা চায় এটা বোঝাতে যে, আমরা আর আগের মতো নেই, আমরা নিজেদের সংশোধন করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি ওদের জিজ্ঞেস করা হয়, তবে কি 'The suspension of all established order'— ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে এডমান্ড বার্ক যা কবেই বলেছেন, তাতেই সম্মতি রাখছে কমিউনিস্টরা? পৃথিবীর কোথাও কোনো প্রান্ত পাওয়া যাবে না যেখানে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘাত ঘটেনি। কমিউনিস্টরা বলে 'Genesis of Intellectual capital as property', তার পরেও Prague spring ঘটেছিল। চেকোস্লোভাকিয়ার মানুষ তাঁদের দেশের সর্বত্র এমন সব মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন, যা কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর

শাসনকালে ছিল প্রায় অকল্পনীয়। একটি স্বাধীন, আধুনিক ও মানবিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে চেকোস্লোভাকিয়ানদের গৃহীত পদক্ষেপগুলি মস্কোকে উত্তেজিত করে তোলে। অন্যদিকে চেক জনগণের মনে বসন্তের নতুন ফুল ফোটার মতো করেই জন্ম নিয়েছিল নতুন আশা। কিন্তু প্রাগের সেই বসন্তের ফুলগুলো পুরোপুরি ফোটার আগেই সোভিয়েত ট্যাঙ্ক গিয়ে সেগুলিকে পিষে ফেলে। বাংলাদেশ থেকে প্রাগ সর্বত্র একটাই সমস্যা— বুদ্ধিবলের অপপ্রয়োগ ঘটিয়েছে কমিউনিস্টরা। যদি ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের দিকেও তাকানো হয়, তবেও দেখা যায় সেই একই কমিউনিস্ট কৌশল। অতএব এটা বোঝা যায় যে, মূলগত সমস্যা এক ও অদ্বিতীয়। কেন পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টদের ভাষণ জলে যাবে, তার আলোচনা করতে হলে বহির্বিশ্বের উদাহরণ আনতেই হবে, কারণ বাঙ্গালিদের ওপর তারা ঠিক সেই অন্যায়টাই করেছে এবং আগামীদিনেও করবে, যা বিশ্বের আরও সব দেশে মানুষের সঙ্গে তারা ইতিপূর্বেই করেছে। স্তালিনের গণহত্যা আর মরিচঝাঁপি গণহত্যার মধ্যে খুব পার্থক্য নেই। 'পলিসি' ও 'পলিটিক্স' আলাদা। তার স্পষ্ট প্রমাণ কমিউনিস্ট পার্টি।

সিপিআই(এম)-এর ২০তম পার্টি কংগ্রেস রেজোলিউশনে দেশজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক উত্থানে তারা 'সাম্প্রদায়িকতা'র অশনিসংকেত দেখে। ১৯৯২-পরবর্তী পর্যায়ে তারা বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি-পরিচালিত সরকারগুলিকে 'অ্যান্টি-সেকুলার সরকার' হিসেবে ঠাওরায়। সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এসআর বোম্মাই রায়ের প্রয়োগ তাদের চোখে এক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল হতেই পারে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এই সরকারগুলির বিরুদ্ধে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতেই পারে। এই মর্মে তারা তাদের পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রেজোলিউশনের ভিত্তিতে ২০০৮ সালে ওড়িশায় এনডিএ-পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান বিদ্বেষের অভিযোগে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের প্রস্তাব আনে। তাহলে একই যুক্তিতে বলা যায় যে, কমিউনিস্ট শাসিত কেরালায় একাধিকবার জাতিবিদ্বেষ, আক্রমণ, হত্যা, সাম্প্রদায়িক হানাহানির ঘটনা ঘটেছে। তখন কি কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পরিচালিত কেরালা সরকারের ওপর ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের প্রস্তাব এনেছে? অথচ এই কমিউনিস্টরা বলে যে, তাদের পার্টি রেজোলিউশন স্থান-কাল-সরকার নিরপেক্ষ!

তারা যে অভিযোগ যখনই তুলবে দেখা যাবে সেই ভুল তারা নিজেরাই অসংখ্য বার করে বসে আছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই দুরাচারীদের সুবিধা এটাই যে, দীর্ঘ বহু বছর তারা ক্ষমতা তো দূর, রাজ্য বিধানসভা কক্ষেই নেই। ফলে তাদের টাটকা অন্যায় চট করে দেখানো যাবে না। কেরালায় কোন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ধর্ষণ করল, সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন সোনা পাচারের অভিযোগে বিদ্ধ হলো, কোন কমিউনিস্ট নেতা প্রকাশ্যে হিন্দু বিদ্বেষী ভাষণ দিল, এ রাজ্যে তা সত্যিই তেমন প্রভাব ফেলবে না এইটুকু আত্মবিশ্বাস এখনও বাঙ্গালি বামপন্থীদের রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা বলছে যে, ক্ষমতায় এলে তারা জমি দেবে শিল্পের জন্য। ওটাও অনৃত ভাষণ। বাস্তব এটাই যে, আজ থেকে মাত্র ১৬ বছর আগে বাম সরকারের আমলে সল্টলেকের জমি বণ্টন নিয়ে রীতিমতো স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছিল। 'বিশেষ কোটায়' জমি দেওয়ার চল ছিল বাম রাজনীতির। আজ বামপন্থীরা জামার কলার তুলে বলে রাজারহাট-নিউটাউন নাকি তাদের জন্য হয়েছে। কিন্তু এটা যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ২০১০ নাগাদ সল্টলেকের বিশেষ কোটার জমি থেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে কেন তাঁর বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল? কোন বিতর্কের জেরে সেই ঘটনাটি ঘটে? তাদের আমলের হিডকো প্রজেক্ট দেখিয়ে আজ তারা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চাইছে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের ১০০ গজের পথশ্রী প্রকল্পেও যেভাবে কাটমানি মিশে রয়েছে তার বৈপরীত্য প্রমাণে 'হিডকো' বাহ্যিকভাবে রাজনৈতিক মোকাবিলার পন্থা। বামপন্থীরা জানে, মানুষের মন থেকে মুছে গেছে হিডকো-র ডিরেক্টর সুমন্ত্র চৌধুরী, রাধাকান্ত ত্রিপাঠী, রমেশ চন্দ্র সিংহর নাম। যারা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের খাতিরে অনেক কিছুই করে গিয়েছেন। এমনকী হিডকোর এক গাড়িচালক নিরঞ্জন শীল ও তাঁর স্ত্রী পূজা শীলকেও 'বিশেষ কোটা'র জমি দেওয়া হয়। এতো একটা ডালের দানার মতো উদাহরণ মাত্র।

সততার যে বুলি বঙ্গীয় কমিউনিস্টরা এই মুহূর্তে আওড়াচ্ছে তাতে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু ওই যে, জল অনেক পুরনো, তাই কে মাপবে, কে তার পরীক্ষা করবে! মানুষের বুদ্ধি ভোঁতা করে এরা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে অভ্যস্ত; পৃথিবীর সব প্রান্তেই তাই করে তারা। তাই সাময়িকভাবে রাজনৈতিক সুবিধা পেলেও এদেশে যখন ভোট শতাংশের হিসেবে কমিউনিস্টরা কমেছে তখন তারা সর্বত্র শূন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়েছে। কমরেডদের একবার পার্টির সংশোধনীতে লেখা উচিত, বাম আমলের মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়ের নাম। চশমা বিল কেলেঙ্কারি থেকে হিডকো জমি— পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসন অজস্র 'প্রশ্ন' ছিল। যার কোনো 'উত্তর' ছিল না। তাই রাজ্যের ক্ষমতাকেন্দ্রে পরিবর্তনের পর কিছুটা সুর নরম করতে বাধ্য হয় এই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, দ্বিচারী কমিউনিস্টরা। আজকে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ, নিবিড় সংশোধনের বিষয়েও রীতিমতো প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে বামেরা। তাতো হওয়াই যায়, কারণ নির্বাচন কমিশনের একাধিক পদক্ষেপ, ভূমিকাতে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে অনেকেই হয়তো নানা প্রশ্ন রাখছেন। কিন্তু কমরেডদের প্রতি আবারও প্রশ্ন— ২০০৮ সালে রাজ্য সরকার পরিচালিত তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেল যেভাবে খসড়া, সচিত্র ভোটার তালিকা তৈরি করেছিল, তাতেও কিন্তু সেই সময় নির্বাচন কমিশন বেজায় চটেছিল। ভোটার তালিকার গরমিলের জন্য ওয়েবেলকে শো'কজ পর্যন্ত করা হয়। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে হয়েছিল সেই খসড়া তালিকায়। আজ যার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ কমিউনিস্টরা করে, সেই ভুলে তারা নিজেরা অনেক আগেই হাত পাকিয়েছে।

এতকিছুর পরেও কমিউনিস্ট পার্টি এবং একশ্রেণীর পেটোয়া সংবাদমাধ্যমের সেই এক চর্বিতচর্বণ— 'পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন সব থাকুক, সরকারি ক্ষমতা থাক বা না থাক, কমিউনিস্ট পার্টিই এক নম্বর।' কমরেডরা যেন ভুলে না যায় রুশ দার্শনিক নিকোলাই বার্দিয়েভের কথা, যিনি নিজেও ছিলেন টগবগে কমিউনিস্ট।

বলশেভিক আন্দোলনের পর তিনি একদিন বললেন, 'নতুন রাশিয়ার সঙ্গে জারের আমলের পুরনো রাশিয়ার বিশেষ তফাত নেই। শুধু খ্রিস্টমতের জায়গায় এসেছে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ। আর জারের জায়গায় পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি।' সেই ট্র্যাডিশন আজকেও চলছে, তাই কমিউনিস্টদের যত ভাষণ তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক জাত রক্ষার লড়াই। প্রতিদ্বন্দ্বী সেই, যারা কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক নীতিহীনতার বিরোধিতা করে। কমিউনিস্ট পার্টির লিখিত রূপ এক, আর প্রয়োগ তার বিপরীত। তাই কোনো রাজনৈতিক দলই কমিউনিস্টদের আজ ঘোর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে দেখে না। ভারতীয় রাজনীতিতে তারা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি তাদের আর কোনো গুরুত্ব দেয় না। □

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাধাসৃষ্টির ফলে হিতে বিপরীত হতে পারে তৃণমূলের

গণতন্ত্রে একমাত্র দেশের নাগরিকদেরই অধিকার নিজেদের শাসককে নির্বাচন করার। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ সেই সুযোগ পান না। পৃথিবীর বৃহত্তম ও অন্যতম সফল গণতন্ত্র হলো ভারত। 'ভারতের নির্বাচন কমিশন' হলো একটি স্বাধীন সংস্থা যাকে ভারতের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার দায়িত্ব দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। সেই অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী প্রয়োগে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থায় সময়ানুগ পরিবর্তন-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচন করিয়ে থাকে। এই নির্বাচনগুলির মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের কথা ও দাবিদাওয়া পৌঁছে যায় দেশের পলিসিমেকার বা নীতিনির্ধারকদের কাছে। ২০২৫ সালে ভোটার তালিকায় এমনই এক সংস্কার কর্মসূচী শুরু করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন, যার নাম— 'স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন' (এসআইআর) বা বিশেষ, নিবিড় সংশোধন। প্রথমে এই সংশোধনীর কাজ শুরু হয় বিহারে এবং গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে আরও ১১টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। দ্বিতীয় দফায় এই সংশোধনীর সময় ১১টি রাজ্যের মধ্যে আসে পশ্চিমবঙ্গের নাম। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে গত বছর জুন মাসে বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ, নিবিড় সংশোধনী শুরু হতেই এই প্রক্রিয়াটিকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে চলে যায় পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এ রাজ্যের করদাতাদের অর্থ ব্যয় করে সেই মামলায় আইনজীবী নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে মদত দেয় তৃণমূল কংগ্রেস চালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যদিও সেই সময় আদালত তাদের যাবতীয় আর্জি খারিজ করে দেয়। দ্বিতীয় ধাপে এসআইআরের কাজ শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে শীর্ষ আদালতে চলছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে দায়ের হওয়া এসআইআর মামলার শুনানি। ফের বড়ো বড়ো উকিল-ব্যারিস্টারদের ফৌজ নেমে গিয়েছে রাজ্যের করদাতাদের পয়সায়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে নামলেন সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে। পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম প্রায় গদগদ হয়ে বিষয়টির রিপোর্টিং শুরু করল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী যে কত বড়ো মাপের একজন আইনজীবী— তা প্রমাণে উদ্বাহু হলো নবান্নের বিজ্ঞাপনপ্রত্যাশী সংবাদমাধ্যম।

কিন্তু গত এক মাসে রাজ্যে হঠাৎ কী এমন আকাশ ভেঙে পড়ল যে, গত ৬ মার্চ ধরনায় বসতে হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে? আসলে শীর্ষ আদালতে যাওয়া ছাড়াও, রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে এসআইআর হওয়া আটকাতে আরও কিছু রাস্তা নেয় পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার। প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস বলা শুরু করে যে, বহু ব্যক্তি ও কয়েকজন বিএলও নাকি এই প্রক্রিয়ার বলি হয়েছেন। আর এ রাজ্যে তাই অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এসআইআর। তৃণমূল কংগ্রেস দল ও রাজ্য সরকারের দাবি অনুযায়ী ১৫০ জন তো দূরের কথা, একজনও বাস্তবে এসআইআরের কারণে প্রাণ হারাননি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তার ভাইপো— দু'জনেই অসত্য ভাষণে পটু। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোনো জেলাশাসক এসআইআর-ঘটিত কারণে কোনো মৃত্যুর ব্যাপারে একটিও রিপোর্ট করেননি নির্বাচন কমিশনে। কারণ তারা জানেন যে, তদন্ত হলেই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। তৃণমূলি প্রচার মিথ্যা বলেই প্রশাসনের নীচুতলার চামচা- বেলচারাও এই বিষয়ে এখন চুপ। এরপর ভোটার তালিকা থেকে মৃত, স্থানান্তরিত, ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে শুরু হয় তৃণমূলি কুৎসা। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের দাবি হলো নির্বাচন কমিশন নাকি নাম কেটেছে বহু বৈধ ভোটারের। কিন্তু যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের মধ্যে থাকা বৈধ নাগরিকদের নাম কেটেছে যারা, তারা '১০০ শতাংশ অনুপ্রাণিত' রাজ্য সরকারি কর্মচারী। কারণ নির্বাচন কমিশনের তো কোনো নিজস্ব কর্মী নেই। বিএলও, ইআরও, এইআরও-রা হলেন রাজ্য সরকারি কর্মী। এরপরে রাজ্যের শাসক দলরে পক্ষ থেকে শুরু হয় মতুয়া সমাজের মানুষদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত করা। এ রাজ্যের ২০০২ সালের শেষতম এসআইআর তালিকায় যে মতুয়াদের নাম নেই; ২০০২-এর পর পূর্ববঙ্গ থেকে যে শরণার্থীরা ভারতে এসেছেন, তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা যাওয়ার কারণ হলো তাদের সিএএ আইনের অধীনে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জেলায় জেলায় তৃণমূল প্রচার করে যে, সিএএ-র অধীনে নিবন্ধীকরণ করলে শরণার্থী মতুয়াদের নাকি নাগরিকত্ব চলে যাবে। এখনও রাজ্য সরকার ও শাসক দল মতুয়াদের ভয় দেখাচ্ছে সিএএ-র বিষয়ে। সিএএ-আইনের অধীনে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির আবেদন করলে তাদের সব সরকারি সুযোগসুবিধা বন্ধের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত বিধানসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতেছে। মুসলমান, বামপন্থী ও সেকুলার লোকজন অধ্যুষিত আসনগুলিতে জয়লাভ করেছে তৃণমূল। এবার কলকাতা ও আশেপাশের এলাকাগুলিতে তৃণমূল ভোট পাওয়ার আশা করলেও মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুরের মুসলমানরা তৃণমূলকে হয়তো ভোট দেবে না সিএএ, ওয়াকফ ইত্যাদির কারণে। তারা এবার কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিছু আসনে মিম, আইএসএফ, হুমায়ুন কবির ফ্যাক্টর হতে পারে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। এই কারণে মতুয়াদের বিপদে ফেলে তাঁদের ভোট নেওয়ার জন্য এই জঘন্য রাস্তা নিয়েছে তৃণমূল।

আজ ৬০ লক্ষ নাম বিচারাধীন হিসেবে ঝুলে থাকার কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে ইআরও, বিএলওদের অলিখিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, শুনানি হওয়া ভোটারদের নথিপত্র শেষ দিনে সিস্টেমে আপলোড করতে হবে যাতে নির্বাচন কমিশন সবকিছু খতিয়ে দেখতে না পারে। আর এতেই হিতে বিপরীত হয়। শীর্ষ আদালত রায় দেয় যে, বিচারকরা ঠিক করবেন এই ভোটারদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা। তবে আগামীদিনে সবচেয়ে বড়ো বিপদে পড়তে চলেছে এ রাজ্যের 'অনুপ্রাণিত' বিএলও, ইআরও-রা। তারা রাজনৈতিক চাপে, অর্থের লোভে ও অনুপ্রেরণায় একদিকে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে ঝুলিয়ে রেখেছে বৈধ নাগরিকদের। নির্বাচন কমিশন আগামী পাঁচ বছর এই তথ্যাবলী সংরক্ষণ করবে এবং পুনরায় খতিয়ে দেখবে। এর ফলে ভবিষ্যতে বহু রাজ্য সরকারি আধিকারিকের চাকরি হারানোর এবং জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বহু ভূতুড়ে ভোটারের নামও বাদ যাবে, যাদের ভুল তথ্য দিয়ে ভোটার তালিকায় যোগ করা হয়েছে। বিহারে ৪০০ জন সরকারি কর্মী কমিশনের শাস্তির আওতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা কম করে ২০০০ ছাড়াতে পারে। এইসব রাজ্য সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের উচিত এখনই আদালতে গিয়ে নিজেদের বাঁচানোর প্রস্তুতি নেওয়া। □

এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'অন্তর্ঘাত' করেও গদি বাঁচাতে পারবেন না মুখ্যমন্ত্রী

ড. বিনয়ভূষণ দাশ

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে খসড়া তালিকা এবং চূড়ান্ত তালিকা মিলিয়ে মোট ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়াকে চেষ্টা করেও বানচাল করতে পারবেন না জেনেও শুরু থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নানাভাবে এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে এসেছেন। শুরু থেকেই প্রথমে তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, এসআইআর তিনি কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গে করতে দেবেন না। তাঁর এই সদম্ভ ঘোষণা সত্ত্বেও রাজ্যে এসআইআর শুরু হলো। তখন তিনি দম্ভোক্তি করলেন, কারও নাম বাদ দেওয়া হলে তিনি দিল্লি কাঁপিয়ে দেবেন। শেষে এসআইআর প্রক্রিয়া চলতে থাকলে তিনি আবার ঘোষণা করলেন, কোনো বৈধ ভোটারের নাম তিনি বাদ দিতে দেবেন না। কিন্তু তার জানা উচিত, এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল কথাই হলো, সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় থাকবে; কিন্তু অবৈধ, মৃত, স্থানান্তরিত, রোহিঙ্গা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভোটারদের নাম তালিকায় থাকবে না।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু গুলিয়ে দিতে ভীষণ পারঙ্গম। তিনি এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে নানা ফন্দিফিকির খুঁজতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, এই প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে পারলে তিনি এসআইআর শুরুর আগের ২০২৫-এর নির্বাচক তালিকার দ্বারাই নির্বাচন করতে বাধ্য করাতে পারবেন নির্বাচন কমিশনকে। বস্তুত তিনি সুপ্রিম কোর্টে ২০২৫ সালের তালিকা দিয়েই নির্বাচন করার আবেদন জানিয়েছিলেন। সুপ্রিম আদালতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়াকে বানচাল করতে না পেরে এই প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। ভোটার তালিকা প্রস্তুত, নির্বাচন পরিচালনা ইত্যাদি ভারতের নির্বাচন কমিশন করলেও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল শিক্ষকদের মাধ্যমে। আর এটা মনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রী আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন যে, এই কর্মচারীরা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করলেও বাস্তবে তাঁরা রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং নির্বাচন শেষে তাঁদের রাজ্য সরকারের অধীনেই কাজ করতে হবে, একথা যেন তাঁরা (অর্থাৎ রাজ্য সরকারি কর্মীরা) মনে রাখেন। এককথায়, নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করা কর্মীদের তিনি আগাম হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন যে, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগের পর্যায়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ হলেও বাকি সমস্ত স্তরের নির্বাচনী আধিকারিকরা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর এই কর্মচারীদের মাধ্যমেই তিনি এসআইআর প্রক্রিয়াতে অন্তর্ঘাত করছেন; প্রক্রিয়াটিকে বিলম্বিত ও দীর্ঘায়িত করছেন। ফলে কয়েকবার এই প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাতেও ২৮ ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়েও সম্পূর্ণ করা যায়নি এই প্রক্রিয়া। কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন বৈধ নির্বাচকের পাশে 'under adjudication' লেখা রয়েছে একাধিকবার শুনানি করার পরেও। এইধরনের সমস্ত নির্বাচকই শুনানির সময় যে সমস্ত দস্তাবেজ তাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল তা তারা জমা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ক্যাটাগরিতে এসেছে। প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র শুনানির সময় জমা দেওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট এইআরও/ইআরও কেন 'আনম্যাপড্' ও 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি'-র আওতায় থাকা সন্দেহজনক ভোটারদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় রাখার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না বা নিলেন এ এক রহস্য! অথচ, যে পরিমাণ সময় ইআরও এবং এইআরও-রা পেয়েছিলেন তাতে এইসমস্ত কাজ পড়ে থাকার কথা নয়। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে জানিয়েছেন, 'It will be pertinent to mention that certain names have been marked as under adjudication since the concerned ERO/AEROS did not decide them after hearing. As a result, those names being pending were sent for

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো, এসআইআর প্রক্রিয়া যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যাতে তিনি দাবি করতে পারেন, যেহেতু এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নির্বাচক তালিকা যথাসময়ে প্রস্তুত করা গেল না, সুতরাং ২০২৫ সালের পুরনো ভোটার তালিকা অনুযায়ীই এবার ভোট হোক।

ফঃ ২

adjudication by judicial officers as per order of the Hon'ble apex court.'

যদিও ডব্লুবিসিএস অফিসারদের সংগঠন সম্প্রতি এটাকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে এটিকে এসআইআর প্রক্রিয়ার দীর্ঘ বিলম্বের দায় তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বলে অভিহিত করেছে। তবে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে যে এই প্রক্রিয়া রূপায়ণে অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, নির্বাচক তালিকা প্রণয়ন অথবা নির্বাচন আয়োজন করা একান্তভাবেই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত; এমনকী ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বিচারব্যবস্থাও এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের সন্দেহজনক ভোটারদের বিষয়টির সমাধানে মাইক্রো-অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। মাইক্রো-অবজার্ভারের দায়িত্বে গ্রুপ-'বি' র‍্যাঙ্কের রাজ্য সরকারি আধিকারিকদের নাম রাজ্য সরকারকে পাঠানোর নির্দেশ নির্বাচন কমিশন দিলেও সেই নির্দেশ পালন করেনি রাজ্য সরকার। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের মাইক্রো- অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করে কমিশন। এর বিরুদ্ধে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দেয় যে, সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে এই ভোটারদের নাম রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে কি না, তা ঠিক করবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে এই কাজ করবেন পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতের বিচারকরা। তাঁরা যে নামগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সেই নামগুলির ওপর 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ছাপ-সহ ভোটার তালিকা প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও-র দপ্তর। সংশ্লিষ্ট বিচারকেরা এ মাসের ৯-১০ তারিখ নাগাদ 'সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা' প্রকাশ করবেন। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন জেলা ধরে ধরে একাধিক সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০ লক্ষ নাম 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' রয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে কমিশন। শুনানি ও নথিপত্র স্ক্রুটিনির দায়িত্বে থাকা বিচারকদের পুরো কাজ শেষ করতে ৮০ দিন পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হতে পারে শীর্ষ আদালতকে জানায় নির্বাচন কমিশন।

কিন্তু কার ইচ্ছায় যে সুপ্রিম কোর্টে একের পর এক আবেদন দায়েরের মাধ্যমে এবং নির্বাচন কমিশনের কাজে বারবার আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করে এই প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা হয়েছে, তা ঘটনাক্রম থেকে পরিষ্কার। আবার গত ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা বেরোনোর পরে যারা ৮ নং ফর্ম পূরণের মাধ্যমে বিভিন্ন সংশোধনীর জন্য আবেদন করেছিলেন তা আড়াই মাস পার হওয়া সত্ত্বেও বস্তুত ধরাই হয়নি; যেমন জমা দেওয়া হয়েছিল তেমনই পড়ে রয়েছে।

এছাড়া আরও এক মজার ব্যাপারও ঘটেছে। অনুপ্রবেশকারী ভোটার বা অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা ভোটারদের বিরুদ্ধে এ রাজ্যের ইআরও, এইআরও-দের কিছু করার ইচ্ছে বা সামর্থ্য না থাকলেও বৈধ নাগরিক ভোটারদের কীভাবে হয়রানি করা যায়, তার উপায় তারা উদ্ভাবন করে ফেলেছেন! অন্য বুথের ভোটার নামাঙ্কিত কিছু লোক হঠাৎই নিজেদের বুথ বাদ দিয়ে অন্যান্য বুথের দীর্ঘদিনের ভোটারদের 'ভারতীয় নাগরিক নয়' বলে দেগে দিয়ে ৭ নং ফর্মের মাধ্যমে অবজেকশন বা অভিযোগ দায়ের করেছে। এদিকে অন্য বুথের ভোটারদের সম্পর্কে তাদের সাধারণভাবে জানার কথা নয়। আর এসবের ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিনের ভোটাররা যাতে নির্বাচন কমিশনের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তার ব্যবস্থা করেছে রাজ্যের শাসক দল ও তাদের অনুগত প্রশাসন। এর সঙ্গে এই সমস্ত কারণে যাতে পুরো এসআইআর প্রক্রিয়াটাই বিলম্বিত হয়, তার চক্রান্ত করেছে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস।

এই ব্যাপারে একটা বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। রাসবিহারী কেন্দ্রের (১৬০ নং বিধানসভা কেন্দ্রের) ১৮৩ নং বুথের ভোটার জনৈক অজয় কর্মকার (ক্রমিক নং -৪৬৮, এপিক নং- LFB3118544)— ১৪২ ও ১৪৩ নং বুথের বেশকিছু দীর্ঘদিনের ভোটারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তারা ভারতীয় নাগরিক নন। আর এই ধরনের ঘটনা যে আরও অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে একথা হলফ করে বলা যায়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন কমিশনকে এইসব ভোটারদের সম্পর্কে তদন্ত করে দেখতে হবে। আর এসবের স্বাভাবিক পরিণতি হলো, এসআইআর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়া। যদিও এইসব মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কোনো শাস্তি দেওয়ার এক্তিয়ার আছে কিনা জানা নেই; যদিও থাকা উচিত। আগেই এটা প্রমাণিত যে, রাজ্যের শাসক দল এবং তার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো, এসআইআর প্রক্রিয়া যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যাতে তিনি দাবি করতে পারেন, যেহেতু এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন নির্বাচক তালিকা যথাসময়ে প্রস্তুত করা গেল না, সুতরাং ২০২৫ সালের পুরনো ভোটার তালিকা অনুযায়ীই ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন করা হোক।

তাঁর আশা, নির্বাচন কমিশন ও আদালত তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁর আবেদনেই সিলমোহর দেবেন। অথবা এমনও হতে পারে, দিল্লিতে যে সমস্ত নামি-দামি উকিলের কথায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ও অনেক সময় প্রভাবিত হয়, তাঁরা হয়তো মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন, যেমন করেই হোক, তারা ২০২৫ সালের পুরোনো ভোটার তালিকা দিয়েই রাজ্যে ২০২৬-এর নির্বাচন করার ব্যবস্থা করে দেবেন সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই হিসেব ভুল বলেই প্রমাণিত হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। বালির বাঁধ দিয়ে জলপ্রবাহ রোধ করা যায় না। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান দেখে মনে হয়, তারা এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই তবে রাজ্যে নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণা করবেন। সেক্ষেত্রে এ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে পুরনো তালিকা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন করানোর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে, এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তবেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়তো করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো এই বিকল্পটি মনে রাখেননি। এই মুহূর্তে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। □

এসআইআর-এর পূর্বাভাস ভোট ডাকাতির জারিজুরি শেষ

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

—'কিতনে আদমী থে'।

—'দো আদমী সর্দার'।

—'ও দো থে, অউর তুম তিন। ফিরভি বাপস আগয়ে, খালি হাত?'

মনে আছে ১৯৭৫ সালের সুপারহিট হিন্দি সিনেমা শোলের সেই জনপ্রিয় ডায়লগটি? ঠিক ৫০ বছর পরে আজ যেন তার পুনরাবৃত্তি। তবে এবার সিনেমার পর্দায় নয়। এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। মাত্র দু'জন ব্যক্তি— দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। মাত্র দুটি ব্যক্তির কারণে তৃণমূলের ভোট ডাকাতির সব জারিজুরি শেষ। রাজ্যের কোষাগারের কয়েক কোটি টাকা খরচ করে কপিল-সিংভি এবং তাদের মতো একশোরও বেশি বাঘা বাঘা উকিলের দল বুঝি বাঁচাতে পারল না মুখ্যমন্ত্রীর সাম্রাজ্য।

ছোটোবেলায় ঠাকুমার ঝুলিতে পড়েছিলাম, রাক্ষস রানির প্রাণ থাকত এক জাদু কৌটায়, ভোমরার ভিতর। ভোমরাটিকে মেরে ফেললেই রাক্ষসকুল শেষ। এই পশ্চিমবঙ্গের ডাকাতরানির প্রাণভোমরা আছে ৩৫ শতাংশ ভোটব্যাংকের ভিতরে বসে থাকা অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে। রানি ও তার ডাকাতদলকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হলে সবার আগে এই অবৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। এই কাজটাই চলছে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই প্রাণ বাঁচাতে এসআইআর আটকাতে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা। সেই লক্ষ্যে শূন্যপ্রায় দেউলিয়া রাজ্যের ভাঁড়ারের আট-দশ কোটি খরচ, বাঘা বাঘা উকিল, সাদা থান কাপড়ের ওপর কালো ওড়না জড়িয়ে নাচন-কোঁদন, অবৈধ নাগরিকদের লুকিয়ে তৈরি করে দেওয়া জাল আধার কার্ড, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট, বার্থসার্টিফিকেট রেখে দিতে বিচারপতিদের হাতে পায়ে ধরা। কিন্তু সব বিফলে। যেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রথম অংশটি প্রকাশ পেয়েছে অমনি ৬৫ লক্ষ নাম বাদ, আর ৬০ লক্ষ বিচারাধীন। ব্যাস, শুরু হয়েছে ডাকাতরানির ছড়ছড়ানি। কারণ সামনেই মরণের হাতছানি।

এসআইআর চলাকালীন বঙ্গবাসী কম রঙ্গ দেখেনি। বস্তির পর বস্তি ফাঁকা হয়ে যাওয়া, হঠাৎ কলোনির ঘরে ঘরে তালা পড়া, পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালিয়া যাওয়ার জন্য লাইন, বাংলাদেশি লাভলি খাতুনদের এরাজ্যে অবাধে কাউন্সিলার হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সব বাঙ্গালি দেখেছে। পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে কত সামিনা বিবিকে ২৬ দিন অন্তর অন্তর বাচ্চা বিয়োতে, বহু ধৃতরাষ্ট্রকে একশো সন্তানের বাবা হতে। শুধু তাই নয়, পেটোয়া সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলের দাক্ষিণ্যে গত দু'মাস ধরে বাঙ্গালি শুনে আসছিল এসআইআর-এর জন্য শত শত মানুষের মৃত্যুর কাহিনি। এক মাসে এ রাজ্যে অসুখেবিসুখে, বার্ধক্যে, ক্যানসারে, হার্ট অ্যাটাকে, কিডনি ফেলিওরে একজনও মারা যায়নি, এমনকী কলেরা- ওলাউঠা- আমাশাতেও কেউ আক্রান্ত হয়নি— যা হয়েছে সবই এসআইআর-এর কারণে। কমিশনের চাপে বিএলও থেকে বিএলও-২, সাধারণ ভোটার থেকে পার্টি ক্যাডার

সকলেই এসআইআর-এর চাপে ও তাপে কাস্টিং লোহার মতো গলে যাচ্ছিল, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। এর নাম হলো এসআইআর সিনড্রোম। যেই ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রথম লিস্ট প্রকাশ পেল, অমনি সব শেষ। এসআইআর-এ মৃত্যু বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের সকলে অমর হয়ে গেল।

দেশের মোট ১২টি রাজ্যে একসঙ্গে এসআইআর চলছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও এরকম ছ্যাবলামো নেই। সবচেয়ে বেশি নাম বাদ গিয়েছে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে। নাম বাদের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে অনেক পরে। কিন্তু যত বিক্ষোভ এই রাজ্যেই। কারণ কী? কারণ রাজ্যের শাসকদল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের ভোটেই বেঁচে আছে। সেই নাম বাদ গেলে তারা খাবে কী? তাই তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা।

কিন্তু প্রথম কিস্তির ভোটার তালিকা শাসক দলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সমস্যা এতো গভীর যে ২০২৬-এ নির্বাচনে জেতার জন্য এবার তাদের অন্য এক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করতে হয়েছে। 'আগামীতে আমরাই জিতছি' এমন ভাব দেখাবার জন্য তারা অন্য দলের বাতিল লোকগুলোকে দলে জয়েন করাচ্ছে। ঘরে বিবাহযোগ্যা বুড়িয়ে যাওয়া মেয়ে থাকলে বাবা-মায়েরা যেমন যাকেই সামনে পায় তার গলাতেই মেয়েকে ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলও ক'দিন আগে সিপিএম নামক ডাস্টবিন থেকে অর্ধউলঙ্গ ছোঁড়াকে ধরে এনে তাকে ডিটারজেন্ট পাউডার আর শ্যাম্পু, ফিনাইলে ভালো করে কেচে ধুয়ে, বডিস্প্রে ছিটিয়ে, জামাই আদর করে ঘরে তুলেছে। সে কে? না প্রতিকুর। এ কী করে? খায় না মাথায় দেয়? সিপিএম-এর কত বড়ো নেতা? এ প্রশ্নটি ভুলেও করবেন না। করলেই বিপদ, সব উলঙ্গ হয়ে যাবে। এই ছোঁড়া একবারের জন্যও কোনো পঞ্চায়েতে জেতেনি। কাউন্সিলার, এমএলএ বা এমপি হয়নি। গত লোকসভা নির্বাচনে ডামন্ডহারবারে দাঁড়িয়ে

যে যে পাকা ঘুঁটি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বার বার বাজিমাত করতেন, এসআইআর- এর পরে সবগুলিই একে একে কেঁচিয়ে যাচ্ছে। তিনি আগেই আভাস পেয়েছিলেন প্রায় এক কোটি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। তাই তাকে কাউন্টার করতে প্রথমে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেড়গুণ বাড়িয়ে দিলেন।

১৭ লক্ষ ১২ হাজারের মধ্যে পেয়েছিল ৮৭ হাজার ভোট। ডবল জামানত বাজেয়াপ্ত। এমনই যার ট্র্যাক রেকর্ড, প্রচার হলো সে নাকি বিরাট নেতা। যুব নেতা। তার কৃতিত্বটা কী? উত্তর— জিরো। বিগ জিরো। যে দল গত ১০ বছরে ৩ শতাংশ ভোটের খদ্দের, সে দলের আবার যুব নেতা— হাস্যকর ব্যাপার। সেই চ্যাংড়া কোন দলে থাকল, না কোন দলে গেল, তার হিসেব বাঙ্গালি রাখবে কেন? যে দলকে শূন্যের গেরো কাটাতে আজ আইএসএফ, কাল হুমায়ুনের পায়ে ধরতে হচ্ছে, তার অকালপক্ক এঁচোড়টির হাতে জোড়া ফুলের পতাকা ধরিয়ে শাসক দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের দাঁত বের করা হাসিই প্রমাণ করছে এবারের ভোটের অঙ্ক বড়ো জটিল।

শুধু কি তাই? প্রতিদিন নিত্যনতুন মিথ্যা ইস্যু তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা। ক'দিন আগে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বসে গেলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। গলার শিরা ফুলিয়ে বললেন— 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে নাকি তারা পশ্চিমবঙ্গে মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করে দেবে।' আচ্ছা, আপনাদের তো বেশ কয়েকজন এমপি। লোকসভা, রাজ্যসভায় যে লাঞ্চ দেওয়া হয় তার মেনুতে মাছ-মাংস থাকে না? দিল্লির সর্বত্রইতো বিজেপি। সেখানে আপনাদের হাড়হাভাতেগুলো গাণ্ডে পিণ্ডে মাছ- মাংস খায় না? দেশের ১৬টি রাজ্যে বিজেপি আর ৪টি রাজ্যে এনডিএ পরিচালিত সরকার। সর্বত্রই তো মাছ-মাংসের রমরমা। টিভির সামনে বসে এমন মিথ্যাগুলো বলতে লজ্জা করে না আপনার? আসলে না, এসব করে বাঙ্গালিকে বিজেপি বিদ্বেষী করার চেষ্টা। কারণ ভবিষ্যৎ স্পষ্ট।

মাসাধিককাল ধরে মুখ্যমন্ত্রী 'বাঙ্গালি বাঙ্গালি' করে পাড়া মাথায় করেছিলেন। ভিন রাজ্যে বাঙ্গালি নির্যাতন'-এর চিলচিৎকার সত্যি যখন প্রকাশ্যে এল— দেখা গেল বাঙ্গালি নয়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ওইসব রাজ্যে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে, তখন অন্য সুর। তবে ক'দিন আগে শাসকদলের বাঙ্গালি প্রীতি তাদের সমস্ত অতীত রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পর্নস্টার সানি লিওন যেন সতীসাধ্বী চরিত্রবতী— শাসক দলের বাঙ্গালি প্রীতি ঠিক তেমনি আগমার্কা। এবারের রাজ্যসভা নির্বাচন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রেখেছে। তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রার্থী করছে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের মতো একনম্বর পিওর বাঙ্গালি— তেলেঙ্গানার (তেলুগুভাষী) মেনকা গুরুস্বামী আর উত্তরপ্রদেশের (হিন্দিভাষী) রাজীব কুমারকে। অবশ্য বঙ্গ ও বাঙ্গালির হয়ে তীব্র লড়াই করার জন্য তারা ইতিপূর্বেই পার্লামেন্টে পাঠিয়েছিল ইউসুফ পাঠান (গুজরাট), শত্রুঘ্ন সিনহা (বিহার), কীর্তি আজাদ (বিহার, দিল্লি), সাকেত গোখলে (মহারাষ্ট্র) সুস্মিতা দেবদের (অসম) মতো যোদ্ধাদের। যেন তাদের জন্ম ও কর্ম কারও বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, আবার কারও-বা দিনাজপুর ২৪ পরগনা নদীয়ায়। সব যেন আমাদের ঘরের ছেলে! যা দেখে বাঙ্গালির সব কিছুই ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে যাচ্ছে।

এসআইআর সন্ত্রস্ত তৃণুরা আর একটি নতুন ইস্যু সামনে এনেছে। 'পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে 'বাংলা' করার ছাড়পত্র কেন্দ্রকে এক্ষুনিই দিতে হবে। কারণ দু'দিন আগেই

কেরালার নাম বদলে 'কেরলম্' হয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বাংলা' করতে আপত্তি কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুমতি না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আবেগকে অপমান করছে।' তাদের সঙ্গে আবার বগল বাজিয়ে যোগ্য সংগত করতে ময়দানে নেমেছে মহাশূন্য সিপিএম। অশিক্ষিত আহাম্মক! ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এ রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ কে রেখেছিল? বিজেপি? নরেন্দ্র মোদী? নাকি তোদের বাপ-দাদা নেহরু-প্রফুল্ল ঘোষ-বিধান রায়রা? তারা কি অশিক্ষিত ছিলেন? কেরালা কি দেশভাগের বলি ছিল? অখণ্ড বঙ্গই তো হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। আজ বঙ্গ ভাগের সেই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিতে আর ঠিক নির্বাচনের আগে বাঙ্গালিকে বিভ্রান্ত করতে এই বাঙ্গালি আবেগে উসকানি।

তবে যে যে পাকা ঘুঁটি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বার বার বাজিমাত করতেন, এসআইআর- এর পরে সবগুলিই একে একে কেঁচিয়ে যাচ্ছে। তিনি আগেই আভাস পেয়েছিলেন প্রায় এক কোটি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। তাই তাকে কাউন্টার করতে প্রথমে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেড়গুণ বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্টবোধ হচ্ছিল। তাই এল অক্সিসিলিন্ডার— যুবসাথী, আগামী ৫ বছরের জন্য যুবক-যুবতীদের দেড় হাজারের গাজরের টোপ। কিন্তু এখানেও প্রমাদ। ৮৫ লক্ষ আবেদন জমা হাতেই চক্ষু চড়কগাছ। সকলেই জেনে গেল পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারদের হতভাগ্য দশা। যার সংখ্যা নয় নয় করে প্রায় দেড়-দু'কোটি হবে। হায় হায় হায়! ডবল ডবল চাকরি দেওয়ার আশ্বাস যে সব ভাঁওতা ছিল তা এবার ধরে ফেলেছেন রাজ্যের মানুষ। আগামী নির্বাচনে তারা বুঝিয়ে দেবে— ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই বেকার ভাতা মোটেই গর্বের নয়, লজ্জার। কিশোর কুমার গেয়েছিলেন 'চিতাতেই সব শেষ'; শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা আজ বলছে, 'ভাতাতেই তোর শেষ'।

তাই এসব করে আর রক্ষা পাওয়া যাবে না। বিজেপি-র পাঁচ হাজার কিলোমিটার ব্যাপী ৯টি পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায় জনসমুদ্র দেখে পিসি- ভাইপোর গলা শুকিয়ে কাঠ। মুখের তেলতেলে লালিত্য উবে গিয়ে কেমন যেন শুকনো উসকো-খুসকো ভাব। দলের মুখপাত্রদের গলায়ও আর আগের মতো দোদোমার তেজ নেই। যেন মিইয়ে যাওয়া ছুঁচো বাজি। চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রথম লিস্ট দেখেই মুখ্যমন্ত্রী কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছেন। বুঝতে পারছেন তাদের সব জারিজুরি শেষ। ২০২১ সালে পায়ে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। বিজেপি-র সঙ্গে ভোটের ব্যবধান ছিল ৪৮ লক্ষ। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই ব্যবধান কমে হয়েছিল ৩৭ লক্ষ। কিন্তু এবার এসআইআর-এর দৌরাত্ম্যে শুরুর ব্রেকফাস্টেই গেছে ৬৫ লক্ষ। সরকার এখনই সংখ্যাতত্ত্বে ভোকাট্টা হয়ে গেছে। এখনো ৬০ লক্ষ নথি সন্দেহজনকের তালিকায়। কোর্টের নির্দেশে সেগুলো বিচারপতিরা খতিয়ে দেখছেন। এর মধ্যে বিশ-পঁচিশ লক্ষ পিছলে গেলেই একেবারে যমের দক্ষিণ দুয়ারে যাবে রাজ্যের শাসকদল। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলনেত্রী হওয়ার যোগ্যতায় থাকবেন কিনা তাও সন্দেহ। কারণ তাঁর কেন্দ্র ভবানীপুরেই ৪৭ হাজার নাম বাদ। আর ১৪ হাজার সন্দেহের তালিকায়। তাই কমপার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রী এখন খুঁজছেন নিজের সেফেস্ট সিট— 'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'। এ যেন খেলা শুরুর আগেই খেলা শেষের বার্তা। এসআইআর-এ তার হাত পা কাটা হয়ে গেছে।

রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণ যখন তাড়কা রাক্ষসীর দুই হাত-পা কেটে দিয়েছিলেন, তাড়কা তখন তাদের গিলে খেতে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছিল। এসআইআর-এ লক্ষ লক্ষ অবৈধ নাম বাদ পড়ার পর, মুখ্যমন্ত্রী বাঁচার শেষ চেষ্টা করছেন। তা হলো ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলে 'অবস্থান', যেখানে তিনি বছর পনেরো আগে একবার বসেছিলেন। অবশ্য সেটা ছিল হাঙ্গার স্ট্রাইক।

নিন্দুকেরা বলে তখন নাকি পর্দার আড়ালে ক্যাডবেরি চকলেট আর বিরিয়ানি সহযোগে 'অনশন' চলত। তখন তো আর আজকের মতো সোশাল মিডিয়া ছিল না। আজকাল বড্ড রিস্ক। কখন কোথায় কে ছবি তুলে ফেসবুক, হোয়াটঅ্যাপে পোস্ট করে দেবে। তার চেয়ে বরং সুখাদ্য অবস্থানই ভালো। গতবার অবশ্য রাজনাথ সিংহ অনশন মঞ্চে গিয়ে তার অভিমান ভাঙিয়েছিলেন। আজ সে রামও নেই, সে রাজনাথও নেই। এখন আমৃত্যু অনশনে বসলে বাঁচাবে কে? তাই সবদিক বিচার করে আমরণ অনশনের পরিবর্তে সুখাদ্য অবস্থানই ভালো।

বসে পড়ুন পিসিমণি। শীঘ্র বসে পড়ুন। এখন একটু রেস্ট নিয়ে নিন। দেখতে দেখতে ভোট ঘোষণা হয়ে যাবে। নমিনেশনও হয়ে যাবে। তার আগেই ৬০ লক্ষের বায়োডাটা চেকিং শেষ। কত লক্ষ যে ঘ্যাঁচাংফু হবে তার ঠিক নেই। তখন তো আবার দৌড় ঝাঁপ। তার আগে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে নেওয়া শরীরের পক্ষে ভালো। তবে হাওয়া বলছে এবার বাঁচা দুষ্কর। ছাব্বিশের নির্বাচনে ডাকাতরানির জারিজুরি শেষ। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

বার্ধক্যের শৃঙ্খলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি

শিল্পহীনতার খেসারত কি তবে এক বিশাল 'বৃদ্ধাশ্রম'?

সোমনাথ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনতাত্ত্বিক কাঠামো এক নীরব আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা যেকোনো মুহূর্তে রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। পরিসংখ্যানের নির্দয় আয়নায় তাকালে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের দ্রুততম বার্ধক্যগ্রস্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা এক ভয়াবহ 'ডেমোগ্রাফিক টাইম-বোমা'র ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভারতের সামগ্রিক প্রজনন হার (Total Fertility Rate) যেখানে বর্তমানে ২.০, যা কিনা জনসংখ্যার প্রতিস্থাপন স্তরের (Replacement Level - ২.১) সামান্য নীচে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (এনএফএইচএস-৫) অনুযায়ী, বাংলার প্রজনন হার নেমে এসেছে ১.৪ থেকে ১.৬-এর মধ্যে, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম এবং সিকিম বা গোয়ার মতো ছোটো রাজ্যগুলোর সঙ্গে তুলনীয়। এই জন্মহার হ্রাসের ফলে একদিকে যেমন শিশুর সংখ্যা কমছে, অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে গড় আয়ু বাড়ায় প্রবীণদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। ভারতের গড় প্রবীণ জনসংখ্যা (৬০+) যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০-১১ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তা ইতিমধ্যেই ১২.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩৬ সালের মধ্যে এটি ১৮-২০ শতাংশে পৌঁছাবে। উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মতো রাজ্যে যেখানে তরুণ প্রজন্মের আধিক্য অর্থনীতিকে জীবনীশক্তি জোগানোর অপেক্ষায়, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ এক 'গ্রেয়িং স্টেট' বা ধূসর প্রদেশে পরিণত হচ্ছে। এই জনতাত্ত্বিক ভারসাম্যহীনতা কেবল সংখ্যার খেলা নয়, এটি এমন এক ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করছে যেখানে রাজ্যে কর্মক্ষম মানুষের

চেয়ে নির্ভরশীল প্রবীণ মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি হবে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এই ভয়ংকর জনতাত্ত্বিক রূপান্তরের নেপথ্যে রয়েছে গত দেড় দশকের সুপরিকল্পিত শিল্পহীনতা এবং কর্মসংস্থানের অভাব। যখন একটি জনপদে বড়ো কোনো উৎপাদনশীল শিল্প গড়ে ওঠে না, তখন সেই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার তরুণ যুবসমাজ পরিযায়ী হতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই 'ব্রেন ড্রেন' এবং 'লেবার ড্রেন' এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিক্ষিত মেধা চলে যাচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ বা গুরগাঁওয়ে আইটি এবং গবেষণার কাজে, আর অদক্ষ বা অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকরা বাধ্য হচ্ছে কেরালা, গুজরাট বা অন্ধ্রপ্রদেশে নির্মাণ কিংবা কৃষি কাজ করতে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে যা তৈরি হয়েছে তা হলো এক 'ডেমোগ্রাফিক ভ্যাকুয়াম'। রাজ্যের ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সি যে জেনারেশন ট্যাক্স দেওয়ার কথা ছিল, লোকাল মার্কেটে টাকা খরচ করে ইকোনমিক সার্কুলেশন সচল রাখার কথা ছিল, তারা আজ রাজ্যের বাইরে অন্য প্রদেশের জিডিপি বাড়াতে ব্যস্ত। রাজনৈতিক দলগুলোর সস্তা পপুলিজম এবং সিন্ডিকেট-তোলাবাজির সংস্কৃতির কারণে নতুন কোনো বিনিয়োগ না আসায় পশ্চিমবঙ্গের মাটি আজ তার সন্তানদের অন্ন জোগাতে পারছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রজনন হার কমে যাওয়া, যা মূলত সচেতন মধ্যবিত্তের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতারই এক প্রতিচ্ছবি। মানুষ যখন দেখে যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তখন তারা সন্তান প্রতিপালনের ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। ফলে একদিকে তরুণদের বহির্গমন এবং অন্যদিকে নিম্ন জন্মহার--- এই দ্বিমুখী মরণ কামড়ে পশ্চিমবঙ্গের জনতাত্ত্বিক পরিকাঠামো আজ ধ্বংসের কিনারে দাঁড়িয়ে।

জনসংখ্যার এই বুড়িয়ে যাওয়ার সরাসরি আঘাত পড়ছে রাজ্যের পুঁজি গঠন (Capital Formation), সঞ্চয় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক সঞ্চালনের ওপর। অর্থনীতিবিদদের মতে, তরুণরাই হলো সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রধান উৎস। যখন রাজ্যের একটি বড়ো অংশ বৃদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তাদের উপার্জনের একটি বড়ো অংশ খরচ হয় চিকিৎসা এবং ওষুধের পেছনে, যা কোনো উৎপাদনশীল কাজে লাগে না। কর্মক্ষম জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় রাজ্যের ট্যাক্স বেস (Tax Base) ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে, অথচ ঋণের সুদ এবং সামাজিক সুরক্ষার ব্যয় পাহাড়প্রমাণ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নির্ভরশীলতার অনুপাত (Dependency Ratio) জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি, যার অর্থ হলো খুব অল্প সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষের ওপর

অনেক বেশি সংখ্যক বৃদ্ধ ও শিশুর ভরণপোষণের ভার চেপেছে। যখন পরিবারের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে যায়, তখন ব্যাংকে আমানত কমে, ফলে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা সংকুচিত হয় এবং নতুন কোনো শিল্পোদ্যোগ শুরু করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ আজ কেবল একটি 'কনজাম্পশন ইকোনমি' বা ভোগবাদী বাজারে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রবীণদের জমানো পুঁজি বা পেনশনের টাকা দিয়ে বাইরের রাজ্যের পণ্য কেনা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় পুঁজির 'আউটফ্লো' হচ্ছে কিন্তু রাজ্যের ভেতরে কোনো নতুন 'ক্যাপিটাল অ্যাসেট' তৈরি হচ্ছে না। এটি একটি মৃতপ্রায় অর্থনীতির লক্ষণ, যেখানে সঞ্চয় নিঃশেষিত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সঞ্চালন কেবল সস্তার সরকারি অনুদানের ওপর টিকে আছে, যা আদতে কোনো দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি ঘটাতে সক্ষম নয়।

রাজ্যের এই আসন্ন বার্ধক্যকে সামলানোর জন্য যে ধরনের উন্নত জেরিয়াট্রিক কেয়ার (Geriatric Care) বা প্রবীণ সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানে চরমভাবে ব্যর্থ ও উদাসীন। রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজও ব্রিটিশ আমলের 'রেফার-রাজ' এবং অপ্রতুল পরিকাঠামোয় জর্জরিত। গ্রামীণ বা মফস্সল এলাকায় প্রবীণদের বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য কোনো আলাদা বিভাগ বা জেরিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ নেই বললেই চলে। স্বাস্থ্যসাথীর মতো বিজ্ঞাপনী প্রকল্পের প্রচার চললেও, বাস্তবে প্রবীণদের জটিল ও ব্যয়বহুল অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালগুলো বকেয়া টাকার অজুহাতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। প্রবীণদের জন্য কোনো 'ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট সিস্টেম' বা সামাজিক কেয়ারগিভার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কোনো প্রচেষ্টাই গত ১৫ বছরে নবান্নের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। একাকী প্রবীণদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতটাই ভঙ্গুর যে শহর থেকে গ্রাম--- সর্বত্রই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আজ জমি মাফিয়া বা অপরাধীদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছেন। 'এম্পটি নেস্ট সিনড্রোম'-এ আক্রান্ত

যদি আমরা আমাদের জনতাত্ত্বিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হই, তবে পশ্চিমবঙ্গের এই ধূসর আকাশ আরও ঘনীভূত হবে।

প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নে নেই কোনো কাউন্সিলিং ব্যবস্থা। সরকারের সমস্ত মনোযোগ কেবল মেলা, খেলা আর ভোটের মাস দুয়েক আগে অনুদান বিলির দিকে। প্রবীণরা যখন চিকিৎসা না পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছেন, তখন শাসকদলের নেতারা উৎসবে কোটি কোটি টাকা ওড়াতে ব্যস্ত। এই চরম অমানবিক অবহেলা প্রমাণ করে যে, এই প্রশাসনের কাছে প্রবীণরা কেবল একটা সংখ্যা, যাদের প্রয়োজন মিটে গেলে তারা রাজ্য সরকারের কাছে স্রেফ একটা বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আগামী এক দশকের মধ্যে এই জনতাত্ত্বিক টাইম-বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে পশ্চিমবঙ্গের সমাজব্যবস্থা এক চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ অত্যন্ত কঠিন কিন্তু অপরিহার্য। প্রথমত, সরকারকে 'খয়রাতি অর্থনীতি' থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত শিল্পায়নে জোর দিতে হবে যাতে রাজ্যের যুবশক্তিকে ফিরিয়ে আনা যায়। যদি কর্মক্ষম মানুষ রাজ্যে না ফেরে, তবে এই বিশাল বৃদ্ধ জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর মতো আর্থিক শক্তি পশ্চিমবঙ্গের থাকবে না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনীতির বিষমুক্ত করে একে সম্পূর্ণভাবে স্কিল-বেসড বা বৃত্তিমূলক করতে হবে যাতে রাজ্যে স্বনির্ভর অর্থনীতির জন্ম হয়। তৃতীয়ত, রাজ্য সরকারকে প্রবীণদের জন্য একটি পৃথক 'সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ড' গঠন করতে হবে যা স্রেফ বার্ধক্যজনিত দুর্যোগ সামলাতে ব্যবহৃত হবে। চতুর্থত, প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ ও অটোমেশনের মাধ্যমে শ্রমিকের অভাব পূরণ করার কথা ভাবতে হবে, যা জাপান বা জার্মানির মতো বার্ধক্যগ্রস্ত দেশগুলো ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। এর সঙ্গে প্রয়োজন প্রতিটি ব্লকে উন্নত জেরিয়াট্রিক হাসপাতাল এবং প্রবীণদের জন্য একটি ডিজিটাল ডেটাবেস যার মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখা যায়। সময় ফুরিয়ে আসছে; যদি এখনই নীতিনির্ধারকরা তাদের ভোটের চশমা খুলে ভবিষ্যতের এই ভয়াবহতা উপলব্ধি না করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ স্রেফ একটি বিশাল বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হবে যেখানে হাহাকার ছাড়া আর কিছু শোনা যাবে না।

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের এই জনতাত্ত্বিক অবক্ষয় কেবল প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা নয়, বরং এটি দেড় দশকের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অদূরদর্শী রাজনীতির বিষফল। আমরা মেধা ও সংস্কৃতির অহংকার করি, কিন্তু সেই মেধাকে ধরে রাখার মতো পরিকাঠামো আজ আমাদের নেই। যে বঙ্গভূমি একসময় সারা ভারতকে পথ দেখাত, তারই একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গ আজ কেবল প্রবীণদের দীর্ঘশ্বাস আর পরিযায়ী শ্রমিকদের চোখের জলে ভাসছে। একটি প্রদেশ যখন বার্ধক্যে পৌঁছায় অথচ তার পকেটে কোনো সঞ্চয় থাকে না এবং তার উত্তরসূরিরা ভিনদেশে কাজ করে, তখন সেই প্রদেশের পতন অনিবার্য। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ এক ক্রান্তিলগ্নে--- হয় আমাদের আজই কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে, যুবশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়তে হবে, নতুবা ইতিহাসের পাতায় পশ্চিমবঙ্গ কেবল এক পতনশীল রাজ্যের নাম হিসেবে নথিবদ্ধ হয়ে থাকবে। আজকের বৃদ্ধদের অসহায়তা আসলে আগামীর তরুণদের জন্য এক সতর্কবার্তা। যদি আমরা আমাদের জনতাত্ত্বিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হই, তবে পশ্চিমবঙ্গের এই ধূসর আকাশ আরও ঘনীভূত হবে এবং কয়েক দশক পর হয়তো এই রাজ্যের গৌরব কেবলমাত্র দামি বইয়ের পৃষ্ঠায় আর শ্মশানের নিস্তব্ধতায় খুঁজে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষায় এই বার্ধক্যের উপত্যকা থেকে উত্তরণই এখন রাজ্যবাসীর একমাত্র ভবিতব্য। □

হাসিনার প্রশাসনেই ঘাপটি মেরে বসেছিল মীরজাফরেরা

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

শেখ হাসিনার প্রশংসা অনেক করা যাবে, কিন্তু সেই সব প্রশংসা এখন আর বাজারে খুব একটা বিকোয় না। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার ফলে এক ধরনের আত্মতুষ্টি, একগুঁয়ে স্বভাব, স্বজনপ্রীতি এবং তোষামোদকারীদের বেষ্টনীতে ধীরে ধীরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চারপাশে এমন এক বলয় তৈরি হয়েছিল যেখানে সত্য কথা বলা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। যারা বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরতে চাইতেন, তাদের অনেককেই ভুল বোঝানো হতো, সন্দেহের চোখে দেখা হতো, কিংবা ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দেওয়া হতো। ফলত সত্যের জায়গা দখল করে নেয় প্রশংসা, আর সতর্কবার্তার জায়গা দখল করে নেয় আত্মপ্রবঞ্চনা।

শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা থেকে শুরু করে প্রশাসনের নানা স্তরে এমন অনেক মানুষ জায়গা করে নিয়েছিল যারা ক্ষমতার স্রোত বুঝে রং পালটাতে পারদর্শী। রাজনীতির ইতিহাসে এই ধরনের মানুষ নতুন নয়;তারা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়, ক্ষমতাকেন্দ্রের কাছে নিজেদের অপরিহার্য হিসেবে তুলে ধরে, কিন্তু সংকটের সময়েই তাদের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচিত হয়। সরকারি ক্ষমতার কেন্দ্রে যখন এই ধরনের ব্যক্তিরা প্রবেশ করে, তখন তারা ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। ফলে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সরকারের উপলব্ধির মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গোয়েন্দা ব্যবস্থার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা। একটি দেশে গোয়েন্দা সংস্থার কাজ শুধু বিরোধী রাজনীতির নজরদারি করা নয়; বরং দেশের ভেতরে ও বাইরে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করে সরকারের সামনে উপস্থাপন করা। কিন্তু যখন গোয়েন্দা কাঠামো রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখন তথ্যের নিরপেক্ষতা হারিয়ে যায়। তখন বাস্তব সংকেতগুলো চাপা পড়ে যায় এবং সরকার ধীরে ধীরে ভুল ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে।

প্রশাসনের ভেতরেও দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের অনিয়ম, লুটপাট ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ জমা হচ্ছিল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিবর্তে প্রভাব, অর্থ ও ব্যক্তিগত আনুগত্য অনেক সময় বড় ভূমিকা নিয়েছে; এমন অভিযোগ জনমনে ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন একটি প্রশাসনিক যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোতে এই ধরনের প্রবণতা গড়ে ওঠে, তখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা ক্ষয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সব সময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ইতিহাসের ব্যবহারও অনেক সময় রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নে নানা বিতর্ক, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে ইতিহাসের মর্যাদা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভেতরেও বিভাজন আরও গভীর হয়েছে।

দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বিপদ ঘটে তখনই, যখন ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা নেতৃত্বের কাছে বাস্তব পরিস্থিতির নির্ভরযোগ্য প্রতিফলন পৌঁছায় না। কারণ তখন সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় আংশিক তথ্য বা সাজানো বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা অনেক নেতার ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা যায়; চারপাশে তৈরি হয় একটি প্রশংসাকারী বলয়, যেখানে সমালোচনা বা সতর্কবার্তা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে যে সংকট হঠাৎ করে তৈরি হয় না; বরং তা ধীরে ধীরে জমা হতে থাকে। অসন্তোষ, প্রশাসনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক বিভাজন এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ— সব মিলিয়ে একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু যখন সেই সংকেতগুলোকে সময়মতো গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তখন সংকট হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো প্রকাশ পায়।

অনেক বিশ্লেষকের মতে, হাসিনা সরকারের ক্ষেত্রেও সেই ধরনের একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ষড়যন্ত্র বা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে ছিল না, তা বলা যাবে না; কিন্তু একই সঙ্গে এটাও সত্য যে প্রশাসনের ভেতরে এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জমে থাকা অসন্তোষ ও দুর্বলতাগুলো সেই সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছিল। ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়— বহিরাগত আঘাত যতটা না শক্তিশালী, তার চেয়েও বড়ো ভূমিকা রাখে ভেতরের ভাঙন। এটাই ছিল সেই কঠিন বাস্তবতা, যা সময় থাকতে অনেকে দেখেও দেখতে চাননি। প্রশাসনের ভেতরে যারা দায়িত্বে ছিলেন, তাদের অনেকেই দেশের প্রতি নয়, বরং ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি বেশি অনুগত হয়ে উঠেছিলেন। ক্ষমতার আশেপাশে জমে ওঠা সেই স্বার্থান্বেষী চক্র ধীরে ধীরে এমন এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে, যেখানে সত্য, সততা ও নৈতিকতার জায়গা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের শিক্ষা স্পষ্ট। কোনো দেশের পতন এক দিনে ঘটে না। দীর্ঘদিন ধরে ভুল সিদ্ধান্ত, ভুল মানুষকে বিশ্বাস করা, এবং প্রতিষ্ঠানের ভেতরে দুর্নীতি ও অনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফল একসময় দেশের সামনে কঠিন বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। তখন বোঝা যায়, শত্রু শুধু সীমান্তের ওপারে নয়; শত্রু অনেক সময় নিজের ঘরেই বসে থাকে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য এই অভিজ্ঞতা একটি বড়ো সতর্কবার্তা হয়ে থাকা উচিত। কারণ দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সত্য বলার সাহসী মানুষদের উপস্থিতি। আর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো সেই মানুষগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তোষামোদকারীদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি তুলে দেওয়া।

ইতিহাস তাই বারবার মনে করিয়ে দেয়; যে দেশ নিজের ভেতরের মীরজাফরদের চিনতে ব্যর্থ হয়, সেই দেশ একদিন না একদিন তাদের কাছেই পরাজিত হয়। আর শেখ হাসিনার পরিণতিও সে ঐতিহাসিক সত্যের সর্বশেষ দৃষ্টান্ত। □

‘বিজেপি শুধু হিন্দু হিন্দু করে।’

কিছুদিন আগে, কলকাতার একটি সভায় একজন অধ্যাপক বলছিলেন, ‘বিজেপি শুধু হিন্দু হিন্দু করে। এরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।’ তাঁর বলা শেষ হলে আরেক সাহিত্যিক ঠিক এই একই কথা বললেন। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। ওঁদের বক্তব্য শেষ হলে আমি সভাপতির অনুমতি নিয়ে বক্তব্য রাখতে উঠলাম। আমি বলতে শুরু করলাম— সারা ইউরোপে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, চীন, মায়ানমারে মুসলমান বিতাড়ন চলছে। ব্রিটেন মুসলিমদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল। তাদের বাসস্থান, শিক্ষা, সমান রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছিল, এমনকী তাদের আইনসভায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার দিয়েছিল। ব্রিটেনবাসীর উদারতার ফলে ব্রিটেনের লন্ডন-সহ কয়েকটি শহরের মেয়র হয়েছেন মুসলমান, এমনিকী মন্ত্রীও হয়েছেন মুসলমান। মজার কথা, ব্রিটেনে এমন সুযোগ পেয়ে ব্রিটেনের মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও মুসলমান নেতারা ব্রিটেনকে ইসলামিক দেশ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তারা অনেকে কোনো ঢাকাঢাকি না-করেই বলছেন যে, ২০৪০-এর মধ্যেই ব্রিটেন ইসলামি-দেশ হবে। ব্রিটেনের যে ক’টি শহরে মুসলমান মেয়র রয়েছেন সেই শহরাঞ্চলগুলিকে পুরোদস্তুর মুসলমান অধ্যুষিত করার কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে ব্রিটিশ পতাকা সরিয়ে খিলাফতি পতাকা লাগানো হচ্ছে। রাস্তা বা দোকানের গায়ে রোমান অক্ষরে লেখা জায়গার নাম বা নির্দেশাবলী মুছে সে জায়গার উর্দু ও আরবি স্থান করে নিয়েছে। ওখানকার মুসলমানরা স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, তারা ব্রিটেনের ইতিহাস নয়, ইসলামের ইতিহাস পড়বেন। শুধু তাই নয় তারা তাদের এলাকায় স্কুলে ইংরেজি পাঠের জায়গায় উর্দু, আরবিতে লেখাপড়া চালু করেছেন। সেদেশে তারা যত্রতত্র মসজিদ নির্মাণ করছেন এবং তাদের (মুসলমান) এলাকায় যেসব খ্রিস্টান রয়েছেন, তাঁদের প্রার্থনায় বাধা দিচ্ছেন এবং দলে দলে খ্রিস্টানদের ইসলামে ধর্মান্তরণ করছেন। এর ফলে ব্রিটেনবাসীরাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁরা এখন মুসলমানদের ব্রিটেন থেকে বিতাড়নের জন্য প্রতিদিন আন্দোলন করছেন। এ বিষয়ে খবরের কাগজে লেখালেখির মধ্য দিয়ে জনমত গঠন করছেন, এমনকী পার্লামেন্টে সরকারের কাছে দাবি রাখছেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ এমপি টমি রবিনসন দেড় লক্ষ ইংরেজদের সমাবেশে— ব্রিটেন থেকে মুসলমানদের অবিলম্বে বিতাড়নের দাবি করেছেন। এমন দাবি প্রায় রোজ হচ্ছে। আমার প্রশ্ন, মোদীজী ও যোগীজী কি ইংরেজদের কানে মুসলমানদের ব্রিটেন ত্যাগ করার মন্ত্রণা দিচ্ছেন?

মুসলমানদের প্রতি গভীর ভালোবাসা জানিয়ে নানা দেশের মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছিল ফ্রান্স। কিন্তু সেখানেও মুসলমানরা অতি দ্রুত ফরাসিদের প্রতি বিজাতীয় মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। কয়েক বছর আগে তারা ইসলামের শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হঠাৎ প্যারিস-সহ নানা শহরে বাসে-ট্রেনে, সরকারি ভবনে ঢিল ছোঁড়ে ও অগ্নিসংযোগ করে। শুধু তাই নয় তারা একটি বড়ো লাইব্রেরিও ধ্বংস করে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট এম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ মুসলমানদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা নেন, এবং প্রায় ত্রিশটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুসলমানদের চলাফেরার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। কিন্তু এতে খুশি না হয়ে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক নেতারা মুসলমানদের ফ্রান্স ত্যাগ করার জন্য নিয়মিত আন্দোলন করছেন। এই যে ফরাসিরা মুসলমানদের বিতাড়নের দাবি করছেন তা কি মোদীজী বা যোগীজীদের প্ররোচনায়?

কিছু দিন আগে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিওর্জিয়া মেলোনি বেশ কিছু বেআইনি মসজিদ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। এমনকী কিছু পুরনো মসজিদ সংস্কার না-করার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, সেদেশের সরকার নির্দেশ জারি করেছে, যে-ক’টি মসজিদ রাখা হবে সেগুলির ইমাম নিযুক্ত হবেন সরকার দ্বারা এবং নির্দিষ্ট ট্রেনিঙের পর। এই ট্রেনিঙে ইমামদের ইতালীয় সংস্কৃতি, খ্রিস্টমত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান প্রদানের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জার্মানির নব্য নাৎসীরা মুসলমানদের মাইকে আজান দেওয়ার উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কেননা মুসলমানরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আর নাৎসীরা বিশ্বাস করে তিন-ঈশ্বরে। শুধু তাই নয়, জার্মানির মোল্লাবাদীরা ব্রিটেনের মতো জার্মানিকেও মুসলমান দেশে পরিণত করতে চাইছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানদের জার্মানি থেকে বিতাড়নের দাবি শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন জার্মান পত্রপত্রিকা বর্তমানে এই দাবিতে পূর্ণ। প্রশ্ন হলো, জার্মানদের মুসলমানবিদ্বেষের পিছনে কি মোদীজীর ষড়যন্ত্র আছে?

নরওয়ে ও সুইডেনে স্থানীয় লোকজন কোরান পুড়িয়ে ফেলেছে বলে সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই যোগীজী-মোদীজীর প্ররোচনা নেই। স্পেনের অধিবাসীরা মুসলমানদের বিতাড়নের জন্য নিয়মিত মিটিং-মিছিল করছেন।

উত্তর আমেরিকার কয়েকটি রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। মুসলমানরা সেখানে তাদের জন্য হালাল দোকান তৈরি, শরিয়তি বিধিনিষেধ বলবৎ-সহ কুকুর-শুয়োর তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করার দাবি জানাচ্ছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ করে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মিটিং-মিছিল করছে। নিউ ইয়র্কের মেয়র হওয়ার পর জোহরান মামদানি আরও একধাপ এগিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে এলে তাঁকে বন্দি করবেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি নিউ ইয়র্কে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ করে দিয়েছেন। মামদানি-সহ মুসলমানরা আমেরিকার দ্রুত ইসলামীকরণে উদ্যত হওয়ায় আমেরিকানরা রাতিরাতি ইসলাম-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছেন। আমেরিকার বহু শহরে এখন একটাই দাবি, ‘আমেরিকার শত্রু মুসলমানদের বিতাড়ন করো।’

পর্তুগালের নেতা আন্দ্রে ভেঞ্চুরা পর পর কয়েকটি জনসভায় মুসলমান বিতাড়ন চাইছেন এবং তাঁর মিটিংগুলিতে পর্তুগিজ শ্রোতাদের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে।

জাপানে অনেক আগেই মুসলমানদের মজহবি আচরণে বাধা আরোপ করা হয়েছে।

ফঃ ৩

মাইকের মাধ্যমে আজান ও মসজিদ নির্মাণেও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। জাপানে সদ্য নিযুক্ত মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি পর পর কয়েকদিন বলেছেন যে, জাপানে মৃত মুসলমানদের কবর দেওয়ার জায়গা হবে না।

১৯৩০-৪০-এর দশকে চীন-জাপান যুদ্ধে যখন চীন জেরবার, তখন তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা দলে দলে চীনে প্রবেশ করে আইনের পরোয়ানা না করে যত্রতত্র মসজিদ, মাজার ও বাড়ি নির্মাণ করে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অজস্র বৌদ্ধ ধর্মস্থান ধ্বংস করে বা তার গা ঘেঁষে সেগুলি নির্মিত হয়। ১৯৫০ সালে মাও-সে-তুং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে চীনে তৈরি সমস্ত মসজিদ ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তার পরের চীনা কমিউনিস্ট সরকার আরও কঠোর হয়েছে।

মায়ানমারে রোহিঙ্গা নামক মুসলমানরা স্থানীয় বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ধর্মস্থান দখল-সহ, স্থানীয় বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করতে থাকে। ১৯৪০ সালে যখন জিন্না লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান দাবি করেন তখন তাকে সমর্থন করতে রোহিঙ্গা মুসলমান নেতারা জিন্নার সঙ্গে দেখা করে মায়ানমারে মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসস্থান দাবি করে। এবং তখন থেকে দাবি আদায়ের জন্য ভয়ঙ্কর মারদাঙ্গাও শুরু করে। পরবর্তী পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হলে মায়ানমারে সেনাবাহিনী পরিচালিত সরকার রোহিঙ্গা মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেনা অভিযানের কারণে রোহিঙ্গা জেহাদিরা মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়। মায়ানমার সরকার মোদীজী ও যোগীজীর প্ররোচনায় এমন কাজ করেছে বলে মনে তো হয় না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় বিজেপি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তাহলেও তো দেখা যাবে যে, মুসলমানরা প্রতিদিন মজহবি গ্রন্থ পড়ছে। সেই গ্রন্থই তো মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। ওই গ্রন্থ অমুসলমানদের 'কাফের' আখ্যা দিয়েছে। মুসলমানরাই প্রথম দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেছে। তাদের মজহবি গ্রন্থের নির্দেশ— মুসলমানরা মুসলমান ছাড়া কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। তাতে মুসলমানদের অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। ওই গ্রন্থের কোথাও মুসলমানদের--- অমুসলমানদের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থানের কথা বলা হয় । এমনকী রমজানের সময় মুসলমানদের এক মাস রোজা রাখার পিছনে রয়েছে ভয়ঙ্কর নির্দেশ— 'হে বিশ্বাসীগণ, এক মাস কঠোর উপবাস পালন করে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে।'

এই প্রতিবেদকের বক্তব্য শেষ হলে শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। অনেকে বললেন, আমরা তো এতদিন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ভাষণে প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাস করতাম যে, বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল। সত্যিই আমরা কতখানি অন্ধকারে ছিলাম। এই সময় লক্ষ্য করলাম যে, সেই বক্তা দু'জন যারা বিজেপির নিন্দায় মেতেছিলেন, তারা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। নাকি পালাচ্ছেন?

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী,
কালিন্দী, কলকাতা- ৮৯।

শতাব্দীর সাধনায় এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

একটি দেশের আয়তন বিশাল হলেই সেই দেশ বড়ো হয় না। দেশের জনসংখ্যা বেশি হলেও দেশ বড়ো হয় না। দেশে প্রচুর অরণ্য সম্পদ থাকলেও দেশ বড়ো হয় না। খনিজ সম্পদে দেশ ভরপুর হলেও দেশ বড়ো হয় না। ২/৪ জন বিরাট পণ্ডিত দেশে থাকলেও দেশ বড়ো হয় না। ২/৪ জন ধনকুবের দেশে থাকলেও দেশ বড়ো হয় না। যদি উল্লেখিত সব কিছুই দেশে থাকে তবুও দেশ বড়ো হয় না। দেশের নাগরিকেরা নিঃস্বার্থ, ব্যক্তিচরিত্র ও জাতীয় চরিত্রবান, শৃঙ্খলা পরায়ণ এবং সর্বোপরি দেশভক্ত হলেই দেশ বড়ো হয়।

আমাদের আছে উদার বিশ্বজনীন ধর্ম— (যা পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই— তাদের আছে উপাসনা পদ্ধতি বা রিলিজিয়ন মাত্র), আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপদ্ধতি (পরা ও অপরা), আমাদের উদাত্ত সর্বজনীন সংস্কৃতি (যাতে আছে কেবল গ্রহণ। বিসর্জনের নাম গন্ধও নেই), এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে আমরা অলসতার বলি হয়েছি। ফলও অচিরেই ফললো। আমাদের থেকে সব কিছুতেই পিছিয়ে থাকা লুটেরেরা এই দেশে চড়াও হলো। আমরা দাসে পরণত হলাম। প্রকৃতপক্ষে আমরা আগেই তামসিকতার দাসে পরিণত হয়েছিলাম। তারই পরিণতি হাজার বছর পরাধীন থাকা।

আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা স্বদেশবাসীকে মানুষের মতো মানুষে পরিণত করেছে। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা সর্বদাই ছিল প্রবহমান। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলেই পতনের শুরু। অথচ মধ্যযুগের আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের মহান সংস্কৃতি ধারক ও বাহক হবার জন্য উপযুক্তই ছিলাম। মানুষ গড়ার শিক্ষার পথ বন্ধ হবার ফলেই যতসব অনাসৃষ্টি--- পরাধীনতার দাসে পরিণত হওয়া। বর্তমানে দেশের ছাত্রসমাজ অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত। আর আমরা ভোগের দাসে পর্যবসিত। অথচ কে না জানে আমাদের জাতীয় আদর্শ— ত্যাগ ও সেবা। জাতির এই অধঃপতনের কারণ সম্যকরূপে উপলব্ধি করে আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে আমাদের দেশেরই একজন দেশভক্ত মহান ব্যক্তি হাতে-কলমে এই শিক্ষা ও সংস্কার (ত্যাগ ও সেবা) দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠা করেন একটি সংগঠন শুভ বিজয়া দশমীর পুণ্যলগ্নে। ব্যক্তিচরিত্র ও জাতীয় চরিত্র নির্মাণ, অনুশাসন বোধ এবং সর্বোপরি দেশভক্তি জাগাবার জন্য সংগঠিত এই সংগঠনটি আজ পৃথিবীর সব দেশেরই শ্রদ্ধা ও সমীহের কেন্দ্রবিন্দু। এই মহান সংগঠনটিই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এরই নীরব সাধনার ফলশ্রুতিতে শতবর্ষে পৃথিবীর সর্বত্র সনাতনীদের জয়যাত্রার শুভারম্ভ। স্বামীজীর সেই অমোঘবাণী আজ বাস্তবায়িত হবার পথে— 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।

—স্বামী সত্যানন্দ পুরী,
পশ্চিম রামচন্দ্রপুর, বীরভূম।

ত্রিপুরেশ্বরী রানি ত্রিপুরাসুন্দরী

সুতপা বসাক ভড়

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে বহু মহীয়সী মহিলার নাম, যাঁরা নিজ রাজ্য তথা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বীরাঙ্গনারূপে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তথ্য-প্রমাণের অপ্রতুলতার কারণে আমরা তাঁদের কীর্তি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নই, তবু ইতিহাসের তথ্যাদি-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের একজন বীরাঙ্গনাকে আমরা স্মরণ করব, যিনি রাজমালা-তে ত্রিপুরেশ্বরী বা ত্রিপুরাসুন্দরী নামে অভিহিত হয়েছেন।

রাজমালা অনুযায়ী মহারাজ ছেংথুম ফা ত্রিপুরা রাজ্যের একজন বিশেষ পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। তাঁকে সিংহতুঙ্গ ফা এবং কীর্তিধর নামেও অভিহিত করা হতো। তাঁর শাসনকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো একটি বড়ো যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ছেংথুম ফা-র পক্ষ বিজয়ী হয়েছিল।

অসম ও বঙ্গপ্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্য। এটি একটি সুপ্রাচীন দেশীয় রাজ্য। তৎকালীন সময়ে, ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল খুবই অস্থির। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধন পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ভারত অরক্ষিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ওদিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরবি, তুর্কি, পাঠান, মুঘলরা ভীষণভাবে আক্রমণ করতে থাকে। তরাইয়ের যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে (১১৯১ ও ১১৯২ খ্রি:) ইসলামি দস্যুবাহিনী দুর্বার গতিতে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকল। বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণ সেন ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে আক্রান্ত হয়ে সিংহাসনচ্যুত হন বলে একশ্রেণীর ইতিহাসবিদ দাবি করলেও ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালি রাজা ও সামন্তদের প্রবল প্রতিরোধে সমগ্র বঙ্গভূমি দখল করতে পারেনি তুর্কি ও আফগান দস্যুবাহিনী।

এরপর উত্তর-পূর্ব ভারতের দেশীয় রাজন্য ও প্রজা উভয়পক্ষের বিপদ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা প্রথম আক্রান্ত হয়। হীরাবন্ত খান নামক এক ব্যক্তি ত্রিপুরার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্তী প্রজাদের ক্রমাগত লুণ্ঠন করতে থাকে। এই হীরাবন্ত খান ছিল বঙ্গের সুলতানের কর্মচারী ও বিশেষ পরাক্রমশালী। ত্রিপুরাবাসীর দুর্ভোগ দেখে রাজা ছেংথুম ফা হীরাবন্ত খানকে এই কার্য থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন। খান নিষেধ অমান্য করে দুষ্কর্ম করতে থাকলে দেখা দিল সংঘর্ষ।

এদিকে হীরাবন্ত খান লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বঙ্গের সুলতানকে উপহার দিয়ে তার সুনজরে থাকতে চাইল। তাকে ধরার জন্য মহারাজ ছেংথুম ফা বৃহৎ একদল সৈন্য পাঠান। ভয় পেয়ে হীরাবন্ত খান বঙ্গের সুলতানের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। হীরাবন্ত খানের সমর্থনে বঙ্গের সুলতান ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বহু সেনা পাঠায়। বঙ্গের সেনারা ত্রিপুরার রাজ্যসীমানায় উপনীত হলে মহারাজ ছেংথুম ফা, নিজ সেনার থেকে বিপক্ষের সেনা অধিক বিবেচনা করে ভীত হয়ে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র গমনে অনিচ্ছুক হন। তিনি একটি সভা ডেকে যুদ্ধ না করে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর রানি স্বামীকে রণপরাঙ্মুখ দেখে বললেন— রাজ্য রক্ষা করা যদি তোমার সাধ্যাতীত হয়, তবে আমিই জন্মভূমির গৌরব রক্ষার্থে বৈদেশিক শত্রুসৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তিনি ত্রিপুরার সৈন্যদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে উত্তমরূপে খাইয়েদাইয়ে সমরাঙ্গনে নিয়ে যান। ভীষণ সংগ্রামে রণক্ষেত্রে অগণিত সেনা হতাহত হয় এবং ত্রিপুরেশ্বরী বিজয়িনী হন। যুদ্ধাবসানে মহারাজ ছেংথুম ফা রণক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে হতাহত সৈনিকদের দেখে নিতান্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং রানি ত্রিপুরাসুন্দরীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য জয়লাভ করে। যুদ্ধের পরে রানি তাঁর প্রজাদের যথাযথ সেবা শ্রুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। রানির জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে ত্রিপুরা।

এইভাবে স্বনামধন্যা 'ত্রিপুরাসুন্দরী' রানি ত্রিপুরাধিপতী ছেংথুম ফা-র মহিষী বৈদেশিক শত্রু সেনাদের সমরাঙ্গনে বিধ্বস্ত এবং পরাজিত করে, জয়মাল্য ধারণ করেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের ত্রিপুরা রাজ্যের এই অসমসাহসিনী, স্বাধীনচেতা, বীরাঙ্গনা রাজমহিষীর কীর্তি আমাদের গৌরবশালী অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বর্তমান প্রজন্মের মহিলারা পূর্বাপেক্ষা ভালো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছেন। আশা করি তাদের এবং আগামী প্রজন্মের কাছে রানি ত্রিপুরাসুন্দরীর গৌরবগাথা অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের একটি জ্বলন্ত উদাহরণরূপে প্রতীয়মান হবে।

ঋণস্বীকার :
রাজন্য ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত : ড. জগদীশ গণচৌধুরী। রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ।

পরিমিত জল ব্যবহার অভ্যাসে আনতে হবে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, এম.ডি.(হোমিও),

বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। শহরাঞ্চলে সরবরাহকৃত জল পানের উপযুক্ত নয়। গ্রামাঞ্চলেও আর আগের মতো বিশুদ্ধ পানীয় জল সুলভ নয়। তবু জলের অপচয় থেমে নেই। অহেতুক কল খুলে রাখা, সামান্য কাজে বেশি জল ব্যবহার করা, এসব থামছে না- এ বিষয়ে শুধুমাত্র সচেতনতা বাড়ালেই হবে না, পরিবারের সদস্যদেরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহার বিশ্বকে শুধু বিপর্যস্তই করছে না, পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছে একটা অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। পরিবেশের চারটি মৌলিক উপাদানের অন্যতম হলো জল। জলকে বলা হয় জীবন। আর জীবনের অধিকার মানে হলো জলের সঠিক ও পরিমিত ব্যবহার। পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৭০ ভাগ জুড়ে আছে জল যার মোট জলভাগের প্রায় ৯৭.৩ ভাগ হচ্ছে নোনাজল আর বাকি ২.৭ ভাগ হচ্ছে স্বাদু জল। বিশ্বে স্বাদু জলের প্রায় ৬৯ ভাগ রয়েছে ভূগর্ভে আর প্রায় ৩০ ভাগ মেরু অঞ্চলে। যা বরফের স্তূপ হিসেবে জমা আছে এবং মাত্র ১ ভাগ জল আছে নদী ও অন্যান্য উৎসে। সুপেয় জলের অনেক উৎস থাকলেও মূলত পরিবেশ বিপর্যয়, বিশ্বায়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, নগরায়ন, দূষণ ও অপচয়ের কারণে প্রতিনিয়ত জলের উপর চাপ বাড়ছে। বিশুদ্ধ জলের অভাবে অস্বাভাবিক রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। বৃক্কে পাথর, কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো রোগ ও দূষিত জলপান করলে

বিভিন্ন জল বাহিত রোগ যেমন— ডায়ারিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ও বিভিন্ন ভাইরাস জনিত রোগ হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাবে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাওয়াতে নদী শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সেচের জলের পাশাপাশি সুপেয় পানীয় জলের পরিমাণও কমতে শুরু করেছে। জলের অপচয় রোধ করে জল ব্যবহারের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুপেয় জল রক্ষা করা যায়। জলের পুনর্ব্যবহার, সমুদ্রের জল বিবর্ণীকরণ পদ্ধতি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া পাইপ লাইনের লিকেজ মেরামত করা, শৌচকর্ম, স্নান, রান্না, কাপড়, বাসন ও আসবাবপত্র ধোয়ার ক্ষেত্রে পরিমিত জল ব্যবহার করতে হবে। কারণ জলের সংকট একটি বিশ্বজনীন বড়ো সংকট। জলসংকটকে বলা হয় আগামী বিশ্বের চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের একটা নিয়ামক। যতদিন যাচ্ছে এই সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। জাতিসঙ্ঘের এক সমীক্ষায় জানা গেছে, বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ পর্যাপ্ত পানীয় জল পান না। আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় দেড়শো কোটি মানুষের মধ্যে ৭০০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবেন না। কুয়েত, কাতার, ইজরায়েল ইত্যাদি দেশ আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হবার জন্য সমুদ্রের জলকে ডিস্যালাইনেশন প্রক্রিয়ায় তা পানীয় জলে রূপান্তরিত করা ছাড়াও সেচের ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে, যা অনেক ব্যয় বহুল হবার জন্য বেশিরভাগ দেশের পক্ষেই সম্ভব নয় এই ব্যবস্থা নেওয়া। তাই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত জল ব্যবহার বন্ধ করা, জলদূষণের মাত্রা শূন্যে আনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য কাজ এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

নগরায়নের ফলে বিভিন্ন জায়গায় পুকুর, ডোবা, ভরাট করে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কোথাও গ্রামবাসীরা নিজেরাই তাদের প্রয়োজনে পুকুর ভরাট করে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট তৈরি করে নিচ্ছে। ফলে বর্ষার জল পুকুর, নালা, ডোবায় পরে যে মাটির গভীরে যাবে তা-ও যাচ্ছে না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন প্রভৃতি কারণে মাটির জলস্তর ক্রমশ কমছে। ফলে আমরা এখন তীব্র জল সংকটের সম্মুখীন হয়েছি।

গ্রামে যে সব নলকূপ সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছিল তার বেশিরভাগই সচেতনতার অভাবে খারাপ হয়ে গেছে। ফলে গ্রামেও জলের খুবই সংকটজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। নিজেরা সচেতন না হলে জলসংকট তীব্রতর হবে, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এজন্য সামাজিক সচেতনতা জরুরি। জলসংরক্ষণে জনসাধারণ নিজেরা সজাগ না হলে এই সমস্যা কখনই মিটবে না। □

শাসকদলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণের কাজ অব্যাহত

আনন্দ মোহন দাস

বিহার-সহ ১২টি রাজ্যে এসআইআর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার সংশোধন এখন নানা রকম জটিলতায় ফেঁসে রয়েছে এবং যথাসময়ে নির্বাচন হবে কিনা অনেকের মনে প্রশ্ন উঠেছে। তাই ১০ মার্চ সর্বোচ্চ আদালতে শুনানির দিকে অনেকেই তাকিয়ে রয়েছেন। খুব সম্ভবত তারপরই নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ পেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণ হলো মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদল, যারা প্রথম থেকেই এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা ও প্রশাসনিক অসহযোগিতা করেছে। কখনও আদালত, কখনও ধর্ণা, বিক্ষোভ ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিরন্তর বিষোদ্গার করে পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ও তাঁর দল সরকারি কর্মচারী বিএলও এবং অফিসারদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেননি।

সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন উঠলেও অচলাবস্থা কাটাতে স্বাধীন ভারতে এই প্রথম সুপ্রিম কোর্ট ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে বিচারকদের নিয়োগ করেছে। কারণ সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের মতিগতির উপর ভরসা রাখতে পারেনি এবং এসআইআরের প্রতি রাজ্যের অনীহার বিষয়টিও বুঝতে পেরেছিলেন শীর্ষ আদালত। কারণ শাসকদল ভুয়ো ভোটার সংবলিত ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় ভোট করাতে চায়। তাই পশ্চিমবঙ্গবাসী আদালতের এই অভূতপূর্ব ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির নামে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। সাতজন ধৃতরাষ্ট্র পাওয়া গেছে যাদের ১০০ জনের বেশি সন্তান রয়েছে। সর্বাধিক ৩৮৯ জন সন্তানের পিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। ১১৭ জন পিতা ২০ থেকে ১০০ জন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কোথাও পুত্র ও সন্তানের বয়সের ফারাক রয়েছে মাত্র ১৫ বছর। ঠাকুরদার সাথে নাতির বয়সের ফারাক মাত্র ২৫ বছর। ভোটার তালিকায় কারচুপির জন্য অনেককে বাবা সাজানো হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ব্যাহত করতে এই ধরনের কারচুপি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দোষীদের আইনানুগ শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করলেও ৬০ লক্ষ ভোটারের ভাগ্য এখনও বিচারকদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। কারণ ERO/AERO-রা রহস্যজনকভাবে এই বিশাল সংখ্যক ভোটারের বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় দেখা গেছে মোট ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬০৯ জন।এর মধ্যে ৬০ লক্ষ নাম বিচারাধীন থাকায় মোট বাতিল ভোটারের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে এবং মোট বৈধ ভোটারের সংখ্যা আরও কমতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী চূড়ান্ত ভোটার তালিকার বর্তমান স্থিতি নিম্নরূপ ঃ

(১) মোট ভোটার খসড়া তালিকায়— ৭,০৮,১৬,৬৩০
(২) সংযোজন (ফর্ম ৬ ও ৬এ)— ১,৮২,০৩৬
(৩) সংযোজন (ফর্ম ৮)— ৬,৬৭১
(৪) বাতিল (ফর্ম ৭)—৫,৪৬,০৫৩
(৫) বিচারাধীন ভোটার—৬০,০৬,৬৭৫
মোট ভোটার ২৮.০২.২০২৬—৬,৪৪,৫২,৬০৯

এখন পর্যন্ত ৬৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ভোটারের নাম বাদ গেছে। অর্থাৎ খসড়া ভোটার তালিকায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জনের নাম বাতিল ছিল। এই সংখ্যাটি মূলতঃ মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও ভুয়ো ভোটারের পরিমাণ। চূড়ান্ত তালিকায় আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম বাদ পড়েছে। কমিশন সূত্রে খবর নতুন ভোটার সংযোজন হয়েছে ১,৮২,০৩৬ জনের নাম। এছাড়া অন্যান্য ভাবে সংশোধন ও সংযোজিত হয়েছে ৬,৬৭১ জনের নাম।

বর্তমান তালিকার বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে উঠে এসেছে। যেমন সীমান্তবর্তী মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ব্যাপক হারে ভোটার বাতিল হয়েছে বা বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে। এর মূল কারণ শাসকদলের বদান্যতায় ব্যাপক হারে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে ভোটার হয়েছিলেন।মোট বিচারাধীন/সন্দেহজনক ভোটারের ৪০ শতাংশ নিম্নলিখিত ৭টি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

(১) মুর্শিদাবাদ— ১১,০১,১৪৫
(২) মালদহ— ৮,২৮,১২৭
(৩) উত্তর ২৪ পরগনা— ৫,৯১,২৫২
(৪) দক্ষিণ ২৪ পরগনা— ৫,২২,০৪২
(৫) উত্তর দিনাজপুর— ৪,৮০,৩৪১
(৬) নদীয়া— ২,৬৭,৯৪০
(৭) কোচবিহার— ২,৩৮,১০৭

এই সমস্ত জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা অধিক পরিমাণে রয়েছে এবং এখানে ভোটার বৃদ্ধির হার অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক বেশি। কারণ এই সমস্ত এলাকায় বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা অনেক বেশি।

দীর্ঘ চার মাস যাবৎ ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনীর পর মোট ৬৩.৭০ লক্ষ বাতিল ভোটারের মধ্যে নিম্নলিখিত ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি ভোটারের সংখ্যা কমেছে।

	বিধানসভা	বাতিল	শতকরা হ্রাস
(১)	হাওড়া দক্ষিণ	৮৩,২৬৭	২৯.১
(২)	জোড়াসাঁকো	৬৬,৪৯১	৩৪.০৭
(৩)	চৌরঙ্গী	৬২,৬৯৫	৩১.৬
(৪)	কাশীপুর-বেলগাছিয়া	৬২,০৪৭	২৬.৮
(৫)	শ্রীরামপুর	৫৬,৭৮৯	২০.৯
(৬)	বালিগঞ্জ	৫৫,৪০৬	২২.৬
(৭)	বিধাননগর	৫৪,০৬৪	২১.০০
(৮)	শ্যামপুকুর	৫১,৯১৮	২৮.০০
(৯)	কলকাতা বন্দর	৫১,৬৯৬	২২.৩
(১০)	জগদ্দল	৫১,৬৪১	১৯.৭

লক্ষণীয়ভাবে এই সমস্ত কেন্দ্রে গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থীর জয়ের মার্জিন বেশ কম।

এছাড়াও কলকাতার ১৪.৪ লক্ষ এবং রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও ব্যাপক সংখ্যক সন্দেহজনক ভোটারদের ভাগ্য বিচারকদের সিদ্ধান্তের উপর ঝুলে রয়েছে।এর মধ্যেও বেশ কিছু ভোটার বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বাতিল ভোটারদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী আরও জানা যায় যে, গত ২০২১ সালে ৩৫টি বিধানসভায় জয় পরাজয় নিষ্পত্তি হয়েছিল ৫০০০-এর কম ভোটের মার্জিনে। কিন্তু এই সমস্ত কেন্দ্রে ভোটার বাতিলের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি।এর ফলে বিজয়ী প্রার্থীরা চিন্তায় রয়েছেন।এই রকম ৩৫টি বিধানসভার মধ্যে ২২ টি কেন্দ্রে বিজেপি জয়লাভ করেছিল এবং বাকি ১৩টিতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। এছাড়াও ২০২১ সালে প্রায় ৩৭ টি কেন্দ্রে বিজেপি ৮-১০ হাজার ভোটে বিভিন্ন কেন্দ্রে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এসআইআরের পর এই সমস্ত কেন্দ্রেও বাতিল ভোটারদের সংখ্যা জয়ের মার্জিনের চেয়ে অনেক বেশি।

আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে জয়ের মার্জিন প্রদত্ত ভোটের মোটামুটি ২ শতাংশের নীচে। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি মূলত উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে অবস্থান করছে। কিছু তথ্য নীচে উল্লিখিত হলো।

বিধানসভা	জয়ের মার্জিন ('২১)	ভোটার বাদ
জলপাইগুড়ি	৯৪১	৮৩৮৭
দিনহাটা	৫৭	১৫৪৬০
বলরামপুর	৪২৩	১৯৫২৬
দাঁতন	৬২৩	৮৬০৯
তমলুক	৭১৩	৮৪৩৪
ঘাটাল	৯৬৬	১১৪৫২
কুলটি	৬৭৯	৩৮৮৩২

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পরেও শাসকদলের চক্রান্তে দলের মদতপুষ্ট বিএল ও এবং অন্যান্য নির্বাচনী অফিসার দ্বারা বেশ কিছু মৃত, বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই নামগুলি অবিলম্বে বাদ না গেলে নির্ভুল ভোটার তালিকা ছাড়াও দেশের সুরক্ষা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ উঠেছে যে বাগদার একটি বুথের ভোটার তালিকায় এক বাংলাদেশি মুসলমান সইদুল বিশ্বাস ও তার পরিবারের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমনকী তার কাছে বাংলাদেশের ভোটার কার্ড রয়েছে। তথ্য প্রমাণ সহ জেলা শাসকের কাছে রাজনৈতিক দল অভিযোগ জানানো স্বত্ত্বেও নাকি সইদুল ও তার পরিবারের সদস্যরা এসআইআরের পর ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বেশ কিছু পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুর (মতুয়া, নমঃশূদ্র) নাম বাতিল বা সন্দেহজনক তালিকায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের চাপে সংশ্লিষ্ট বিএলও বহু মতুয়া ও বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়েছে। কারণ এরা শাসকদলের ভোটব্যাঙ্ক নয়। কিন্তু এদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে দল ভোট বৈতরণী পার হতে চায়। এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

প্রথম থেকেই রাজ্যের শাসকদলের মুখিয়া এনআরসির জুজু দেখিয়ে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাগরিকত্ব লাভে সিএএ-তে দরখাস্ত করার চরম বিরোধিতা করে আন্দোলন করেছিলেন। এর পরিণাম এখন মতুয়ারা বুঝতে পারছেন। শাসকদল এই সমস্ত বাংলাদেশি উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভুল বুঝিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে অনেকে ভোটাধিকার হারাবেন বলে আশঙ্কা করছেন। যাঁরা দেরীতে হলেও সিএএ-তে দরখাস্ত করেছেন তাদের অনেকেই এখনও নাগরিকত্ব পান নি। যদিও বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য চারটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। তবে সিএএ-র মাধ্যমে বাংলাদেশী হিন্দুদের নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন প্রক্রিয়াটি আরও সরল হওয়া প্রয়োজন। নইলে বহু হিন্দু ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য মতুয়াদের ভোটাধিকারের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে অবিলম্বে নিষ্পত্তি করতে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

কারণ এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় থাকা এবং অবৈধ ভোটারদের নাম বাতিল করা। অন্যথায় এস আই আরের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

পরিশেষে বলা যায় যে চূড়ান্ত তালিকায় বিভিন্ন কেন্দ্রে শাসকের ভোটব্যাংক— ভুয়ো, মৃত, ডুপ্লিকেট ও স্থানান্তরিত ভোটারদের বিপুল সংখ্যা বাদ পড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাদ গুনছে। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ও এসআইআরের ধাক্কায় তারা পরাজয়ের আশঙ্কায় ভুগছে। সেজন্য নানারকম ফন্দিফিকির করে এখনও এসআইআর প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রধান শর্ত হল নির্ভুল ভোটার তালিকা। তাই সঠিকভাবে এসআইআর সম্পন্ন হলেই নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। ■

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১২০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের ব্যবস্থাপনায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ এক রক্তদান শিবির এবং দু'দিন ব্যাপী

বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরে ৬২ জন সহৃদয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিশুমন্দিরের অভিভাবক ও কয়েকজন মাতৃমণ্ডলীর এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কোন্নগর রাজেন্দ্র স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অয়ন ঘোষ, দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ঘোষ ও বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সম্পাদক তপন কুমার ভড়-সহ বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সদস্য দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য।

বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার দাবিতে আন্দোলনে

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘের সক্রিয় অংশগ্রহণ

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকে— সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা, অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ পূরণের দাবি আদায়ে কলকাতার ধর্মতলা থেকে শুরু হওয়া 'কালীঘাট চলো' আন্দোলন কর্মসূচীতে সক্রিয় উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) অনুমোদিত সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ'-এর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়- সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সক্রিয় যোগদান ছিল এদিনের কর্মসূচীতে। এছাড়াও বিএমএসের সদস্য, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী ও অনিয়মিত কর্মচারীরা এদিন 'কালীঘাট চলো' অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

সার্ধশতকণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ নিবেদনে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ

১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত হয় কালজয়ী ‘বন্দে মাতরম্’ গীত, যা ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণশক্তি, মাতৃভূমির প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদনগীতি এবং জাতীয় ঐক্যের মন্ত্র। ব্রিটিশ শাসনকালে বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে এই সঙ্গীত। এই জাতীয় সঞ্জীবনী মন্ত্র রচনার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে চলছে সার্ধশতকণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ গায়ন।

গত ২০, ২১, ২২ ফেব্রুয়ারি সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে পশ্চিম বর্ধমান জেলার সাতকাহানিয়া অঞ্চলে

তেপান্তর নাট্যগ্রামের মুক্তপ্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী ১১টি সত্রের মাধ্যমে আয়োজিত হয় সার্ধশতকণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ গায়ন ও বহুমুখী বিষয় আধারিত আলোচনাচক্র, সেমিনার, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সমবেত ধ্যেয় গীত পরিবেশন ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি কর্তৃক প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল— অখিল ভারতীয় সংস্কার ভারতীর সংগঠন সম্পাদক অভিজিৎ গোখলে, সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ অধীর রায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-পূর্বক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত, সংস্কার ভারতী কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, সহসাধারণ সম্পাদক অমিত দে, কোষপ্রমুখ গোপাল কুণ্ডু প্রমুখ বিশিষ্টজন।

অনুষ্ঠানের প্রথম সত্রে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উপস্থিত সকল সদস্য সম্মিলিত কণ্ঠে অখণ্ড ‘বন্দে মাতরম্’ পরিবেশন করে। ‘বন্দে মাতরম্’ রচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনার মাধ্যমে আশিস গিরি বলেন যে, ১৫০ বছর পর আজও ভারতের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে অনুরণিত হয় এই ‘বন্দে মাতরম্’ গীত, যা দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা ও গভীর তাৎপর্য বহন করে। পরবর্তী অনুষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে ভারতীয় শিল্পের সনাতনধর্মিতা এবং সংস্কার ভারতী স্থাপনার প্রেক্ষাপট ও এই সংগঠনের আধুনিক যাত্রার বিষয়ক বৌদ্ধিক বক্তব্য প্রদানকালীন গোখলেজী বলেন, কলা ও সংস্কৃতি জগতে কলাসাধনের আধার হলো সংস্কার ভারতী। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিতে, দেশ-কালের পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে ভারতীয় কলাজগৎকে প্রভাবী প্রস্তুতি নিতে হবে এবং নিজেকে বিকশিত করতে হবে সেই বিষয়টি তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, সংস্কার ভারতীর কাজের দিশা অনুসারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে এবং উপযুক্ত কার্যকর্তা চয়ন করতে হবে। এছাড়া, সংস্কার ভারতীর চর্চাকেন্দ্রের ব্যাপ্তি ও ভূমিকা, সংস্কার ভারতীর পঞ্চ পরিবর্তনে কলা জগতের ভূমিকা, নবীন কার্য যোজনা সুনিশ্চিতকরণ, সঙ্ঘ ও বিবিধ ক্ষেত্রে সংকল্পনা জাগরণ, শিল্পী-সংগঠক ও কার্যকর্তার স্বরূপ, সংগঠন বিস্তারের পদ্ধতি ও কার্যকর্তাদের কর্তব্য, কোষপ্রধানের কাজের পরিকল্পনা ও দৈনন্দিন কার্যাবলী, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যজীবন আধারিত ‘নাট্যমেলা’ ও ‘নাট্য উৎসবের সূচনা’ ইত্যাদি বিষয় আধারিত আলোচনা ও মূল্যবান বৌদ্ধিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উপস্থিত বরিষ্ঠ অধিকারীরা। সভা ও উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে

কীভাবে সংস্কার ভারতীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত— তার এক সুন্দর ব্যবহারিক প্রয়োগ পরিবেশন করে সংগঠনের বীরভূম জেলা সমিতির সদস্য-সদস্যারা।

সংস্কার ভারতীতে 'সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারিক প্রয়োগের কৌশল ও ফিল্টার ছাড়া আগমনী'— এই বিষয়ে বক্তব্য রাখা-সহ একটি সুন্দর ভিজ্যুয়াল আর্ট প্রদর্শন করেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। একক গীত পরিবেশন করেন অমিত দে, নির্মলা ভট্টাচার্য্য, দীপান্বিতা শর্মা, অনিমা দাস মজুমদার প্রমুখ শিল্পী। নৃত্যার্পণ করেন কাবেরী পুইতন্ডি, সমর্পণ সেনগুপ্ত, সপ্তার্ষ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অতসী বিশ্বাস, সমীক্ষা হাউলি, রাহুল দাস, রেশমি সিনহা, দেবলীনা দাস-সহ বীরভূমের নৃত্যশিল্পীরা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বরূপ সরকার, শুক্লা দত্ত, সঙ্ঘমিত্রা কবিরাজ, গৌরী সেনগুপ্ত ও মেহেন্দি চক্রবর্তী।

'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের কার্যক্রম, বঙ্গনাট্যমেলা- সহ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সংক্রান্ত আলোচনা, নাট্যচর্চা, নাট্য-আলোচনার পাশাপাশি গত ২১ ফেব্রুয়ারি একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। অমিত দে রচিত ও পরিচালিত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জীবন অবলম্বনে শ্রুতিনাটক 'সঙ্ঘ প্রণেতার ডায়েরি' পরিবেশন করেন সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের নাট্যশিল্পীরা।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত জানান যে, ললিতকলা ও সাহিত্যে সমর্পিত সংগঠন 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত'-এর পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে মূল ভাবনা হলো 'বন্দে মাতরম্' যে কেবল একটি সঙ্গীত বা অতীতের স্মৃতিমাত্র নয়, এটি যে ভারতের জাতীয় চেতনার প্রতীক তা তুলে ধরা। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই বার্তাটি সংস্কার ভারতীর মতো বৈচারিক সংগঠনের মাধ্যমে সুচিন্তিত পদ্ধতিতে প্রচার-প্রসার করা।

সঙ্গীত প্রমুখ তনুশ্রী মল্লিকের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপন হয়।

সিউড়ীতে 'শ্রদ্ধা'র উদ্যোগে ১৬৯তম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান

সিউড়ী তথা বীরভূম জেলার একমাত্র সংস্থা 'শ্রদ্ধা' ২০০৮ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৬৯ জন সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে। গত ১ মার্চ 'শ্রদ্ধা'র পক্ষ থেকে ৯০ বছর বয়স্কা বেবী সরকার মহোদয়াকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় সিউড়ীর ভট্টাচার্য পাড়ায়। এদিন

ব্রহ্মনাদের মাধ্যমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন 'শ্রদ্ধা' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে 'শ্রদ্ধা' সংস্থার উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেন তিনি। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সংস্থার সহ-সভাপতি দামোদর ঘোষাল। বেবী সরকারকে পূজন করেন তাঁর কন্যা দেবযানী দাস। তাঁকে মাল্যনিবেদন করেন কল্পনা বিষ্ণু। মানপত্র পাঠ করেন সংস্থার সহ-সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। অর্ঘ্য হিসেবে তাঁকে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন সংস্থার অনুভবী সুজাতা বিষ্ণু, লক্ষ্মী ঘাটি, শুভ্রা ঘোষ প্রমুখ। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মায়ের সম্পর্কে বললেন তাঁর পুত্র কৃষ্ণ সরকার। 'শ্রদ্ধা' সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধান শিক্ষক অরিজিৎ বক্সী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অসীমা মুখোপাধ্যায় ও রিমি সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস ও অন্যান্য বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। লক্ষ্মণ বিষ্ণুর কণ্ঠে শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কলামন্দিরে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় শেক্সপিয়র সরণী-স্থিত কলামন্দিরে অখিল ভারতীয় কল্যাণ আশ্রমের অন্তর্গত পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা-হাওড়া মহানগর সমিতির ৪৩ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বনির্ভরতা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যমে বনবাসী উপজাতি ও জনজাতিদের সামাজিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল— জনজাতি সমাজের সশক্তীকরণ এবং সুষম উন্নয়নমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় জনজাতি সমাজকে জাতীয় জীবনের মূলধারায় নিয়ে আসা। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর শাখা জনজাতি সমাজের উন্নয়নের জন্য নিরন্তরভাবে কাজ করে চলেছে। জনজাতিদের শিক্ষা, চিকিৎসা সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতা বিকাশের ক্ষেত্রে তারা অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন হরিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রমোদ গুপ্তা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্যাম আগরওয়াল। উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ডাঃ চুনারাম মুর্মু, হাওড়া মহানগর সমিতির অধ্যক্ষ দিনেশ কুমার ককরানীয়াঁ, কলকাতা মহানগর সমিতির অধ্যক্ষ রণজিৎ আগরওয়াল এবং মহানগর মহিলা সমিতির অধ্যক্ষা শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ। ডাঃ শ্যাম আগরওয়াল তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন যে, শৃঙ্খলার মাধ্যমেই সমাজকল্যাণ সম্ভব। ভারতীয় জনজাতি সমাজের ক্ষমতায়ন এবং ভারতের বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে জনজাতিদের সংযুক্ত ও একীভূত করার লক্ষ্যে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম যে ধারাবাহিকভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, সেই বিষয়টিও তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এদিন তুলে ধরেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা, লেখক ও অভিনেতা ড. চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী। অরণ্য থেকে নগরে মানব সভ্যতার বিবর্তনের বিষয়টির উল্লেখ-সহ ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বনাঞ্চলের গুরুত্বের কথা তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। রামায়ণ হতে বিভিন্ন উদ্ধৃতিদান করে তিনি বলেন যে, ভারতের বনাঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

সভাপতির ভাষণে জনজাতি সমাজের সেবায় পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন শ্রীগুপ্তা। তিনি বলেন যে, জনজাতি সমাজকে প্রায়শই জাতীয় জনজীবনের মূলধারার বাইরের বলে মনে করা হয়। যদিও এই ধারণার বিপ্রতীপে তারা সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ তাঁদের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডে শ্রীহনুমানের উল্লেখ রয়েছে। সেই উদাহরণগুলির বিষয়োল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ভারতের বনবাসী, জনজাতি সমাজ ঐতিহ্য ও পরম্পরাগতভাবে বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা, ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার নীতিসমূহকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। উপজাতি সমাজের উন্নয়নকে তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, এই সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হলো একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। এই সময়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রাসঙ্গিকতার ওপর জোর দিয়ে ভগবান শিবকে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির প্রতীক রূপে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সত্রের অধিবেশনে হয় নরেশ বাবা শ্যামের উপাখ্যান- আধারিত 'হারে কা সাহারা— বর্বরীক শ্যাম হামারা' শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা। প্রযোজনাটি পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক সংস্থা 'মধুরা'র শুভ্রা আগরওয়াল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও জনজাতি সমাজের বিপুল সংখ্যক সদস্য। দেশ ও জাতি গঠনে উপজাতি সমাজের শক্তিশালী ও অগ্রণী ভূমিকার লক্ষ্যে সভাগৃহে উপস্থিত সকলের অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ‘বিকশিত ভারত-২০৪৭’ বিষয়ক আলোচনাসভা

গত ১২ ফেব্রুয়ারি স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে এবং বড়বাজার লাইব্রেরি ও বিবাদীবাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় কলকাতা-স্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় ‘স্বদেশী অর্থনীতি ও কেন্দ্রীয় বাজেট’ এবং ‘বিকশিত ভারত-২০৪৭’ বিষয়ক আলোচনাসভা। সমবেত কণ্ঠে

জাতীয় সংগীত এবং ভারতমাতা ও দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন হরিয়ানার রাজ্যপাল অধ্যাপক অসীম কুমার ঘোষ। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বিধায়ক ড. অশোক কুমার লাহিড়ী। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা ড. অজয় প্রতাপ সিংহ, সংবাদ সাপ্তাহিক ‘স্বস্তিকা’র সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা, সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, সংস্কার ভারতীর কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডু, বিশিষ্ট সমাজসেবী ড. সুতনু সামন্ত, রাজকমল পাঠক-সহ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা অম্লান কুসুম ঘোষ, স্বস্তিক শর্মা, কমল সোমানি, আর কে ব্যাস, অশোক মাহেশ্বরী, সুভাষ সরাফ, পঙ্কজ ধানুকা, অনিল মণ্ডাবেওয়ালা প্রমুখ বিশিষ্টজন। স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় অর্থবাজেটের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের জাতীয় সহ-আহ্বায়ক ও স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্দেশক ড. ধনপত রাম আগরওয়াল। ২০১৪ পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক প্রণীত অর্থবাজেট ও বিভিন্ন আর্থিক নীতি কীভাবে দেশজুড়ে স্বদেশী অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক হয়েছে সেই বিষয়টি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘স্ব’-এর চেতনা দেশজুড়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং এই কারণে ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে।

এরপর বক্তব্য রাখেন এদিনের সভার প্রধান বক্তা ড. অশোক কুমার লাহিড়ী। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদন বাড়লে দেশ আমদানি-নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর সংকল্পে পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে গত এক দশকে ভারতের বহুগুণ অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক অনুযায়ী ২০৪৭-এর মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ নির্মাণ অবশ্যই সম্ভব বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তির বিষয়টিও তিনি বিশদে আলোচনা করেন। এ রাজ্যের জন্য বরাদ্দ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গও আগামীদিনে একটি উন্নত রাজ্য হয়ে উঠবে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। এই আর্থিক বছরের কেন্দ্রীয় অর্থবাজেটের বিভিন্ন দিকগুলি সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেন এদিনের সভার প্রধান অতিথি হরিয়ানার রাজ্যপাল অধ্যাপক অসীম কুমার ঘোষ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ‘স্ব’-এর চেতনার প্রচার-প্রসারে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের ভূমিকার বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। সকলের বক্তব্যের শেষে অনুষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। কেন্দ্রীয় অর্থবাজেট এবং ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অধ্যাপক অসীম কুমার ঘোষ ও ড. অশোক কুমার লাহিড়ী। প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ড. ধনপত রাম আগরওয়াল। সমবেত কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’-এর মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্যজুড়ে কৃষক সম্মেলন

১৯৭৯ সালের ৪ মার্চ রাজস্থানের কোটা শহরে সঙ্ঘ কার্যকর্তা দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর হাতে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের স্থাপনা হয়। সেই দিনকে স্মরণ করেই সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যের জেলায় জেলায় কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রাণাঘাট-১ ব্লকের তারাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরেশনগর গ্রাম এবং তেহট্ট-১ ব্লকের কুষ্টিয়া হাসপাতাল মাঠে ; উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ ব্লকের দিঘারী গ্রামে ও গাইঘাটা ব্লকের আমকোলা গ্রামে; পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকের বলগোনা সরস্বতী শিশুমন্দির ও মঙ্গলকোট ব্লকের কৈচর গ্রামে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের চাতুরিভারা গ্রামে কৃষক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে।

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার বলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৩৪৬টি ব্লকেই কৃষক সম্মেলনের পরিকল্পনা করেছি। জেলায় জেলায় এই কার্যক্রম চলছে। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের দাবিদাওয়া আদায় করে সম্পন্ন কৃষক সমাজ গঠনের মধ্যে দিয়ে বৈভবশালী দেশ গঠন; পরিবেশের ক্ষতি না করে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ ফিরিয়ে আনা এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কৃষক হিতে কাজ করবে এমন সরকারকে নির্বাচিত করা। রাজ্য সভাপতি অনিমেষ পাহাড়ি বলেন, দেশে কৃষকদের নেতৃত্বে অনেক ইতিবাচক বিপ্লব হয়েছে। যেমন, হোয়াইট রেভোলিউশন (দুগ্ধবিপ্লব-১৯৭০), রাউন্ড রেভোলিউশন (আলু বিপ্লব), রেড রেভোলিউশন (টমেটো বিপ্লব-১৯৮০), সিলভার রেভোলিউশন (ডিম বিপ্লব-১৯৬৯-১৯৭৮), ইয়োলো রেভোলিউশন (তেল বিপ্লব-১৯৮৬-৮৭), গ্রিন রেভোলিউশন (সবুজ বিপ্লব-১৯৬০), গোল্ডেন রেভোলিউশন (ফল, ফুল ও মধু বিপ্লব-১৯৯১-২০০৩), ব্লু রেভোলিউশন (মৎস্য বিপ্লব-১৯৮৫-৯০)। এতকিছুর পরেও কৃষকরা সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদা পাননি। সেজন্য ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ কৃষকদের পাশে থেকে তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কৃষকরা তাদেরই ভোট দেবেন যারা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এই বার্তা আমরা ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে দিতে চাই।

বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেনের ১২০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

১৯০৬ সালের ৪ মার্চ পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেনের জন্ম হয়। গত ৪ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের ঘোষের চক শিবালয় মন্দিরে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্লকুমার সেনের ১২০তম জন্মদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। শিবালয় মন্দিরের তরুণ সন্ন্যাসী রাজমোহন বৈরাগী এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেনের কন্যা ড. পূরবী সেন। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে টিটাগড় মামলায় কারাবরণ করেন বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সেন। বিভিন্ন কারাগারে অতিবাহিত হয় তাঁর জীবনের ১৪টি বছর। কারামুক্তির পর তিনি কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা-সহ, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য ১৪টি কলোনি তৈরি করেছিলেন।

ভারতীয় সভ্যতার বিজ্ঞানসাধনাকে মনে করানোর উৎসব

হিন্দু নববর্ষ— বর্ষপ্রতিপদ

পিন্টু সান্যাল

স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভার নবম দিনে 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।'

হিন্দুদের প্রতিটি উৎসবের পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে আর যেখানে যুক্তি আছে সেখানে বিজ্ঞান আছে। ভারতবর্ষ উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর ইতিহাসকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবহমান রাখে। সমাজের ঐক্যসূত্রকে দৃঢ় করার পদ্ধতি 'উৎসব'। প্রতিটি উৎসবের লোকাচার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতির বার্তা দেয় অর্থাৎ ভারতীয় উৎসবগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর যথার্থতা।

এ তো গেল উৎসবের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিজ্ঞানের কথা, কিন্তু এমন কি কোনো উৎসব আছে যাকে আমরা বলতে পারি ভারতবর্ষের চরমতম বৈজ্ঞানিক সাফল্যের উদ্‌যাপন অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞানের জন্য সমর্পিত উৎসব? হ্যাঁ, আছে। সেই উৎসব 'হিন্দু নববর্ষ' বা 'বর্ষপ্রতিপদ'।

পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন দেশেই নববর্ষ পালনের রীতি আছে। কিন্তু 'হিন্দু নববর্ষ' বা 'বর্ষপ্রতিপদ' উৎসবটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দান অর্থাৎ 'কাল গণনা পদ্ধতি'র কথা স্মরণ করায়।

নববর্ষে যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা যায়, তা সবার জন্যই হয়, তাহলে আলাদা করে শুধুমাত্র 'হিন্দু নববর্ষ' বলার কারণ কী ?

একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রগুলির অনুবাদ পার্সিয়া হয়ে আরবে পৌঁছায় 'হিসাব-আল-হিন্দ' নামে অর্থাৎ হিন্দের হিসাব। হিসাব বা গণনা কোনো বিশেষ স্থানের হয় না, গণিতের নিয়মগুলো স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ ও শাশ্বত। তাহলে কেন অনুবাদক 'হিন্দ' বিশেষ্য ব্যবহার করেছিলেন? কারণ,

এই জ্ঞানের জন্ম হয়েছে যে ভূমিতে, সেই সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করাই উদ্দেশ্য ছিল।

আলবিরুনী ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্বকে পরিচিত করাতে 'হিন্দ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর 'তারিখ-আল-হিন্দ' গ্রন্থে।

বহিরাগত আক্রমণকারী হোক বা পরিব্রাজক, সবাই এই দেশকে 'হিন্দুস্থান' বলে বিশেষিত করেছে আর অধিবাসীদের 'হিন্দু' হিসেবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতবর্ষের রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস জানাতে গিয়ে লিখলেন 'হিন্দু রসায়ন'। তা শুধু ভারতবর্ষের রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস নয়, বরং বিশ্বের রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ভাষার ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথম অধ্যায়েই ভারতবর্ষের নাম আসাটা অনিবার্য, আর সেই জ্ঞানের জন্মদাতা সংস্কৃতি হিসেবে 'হিন্দু' বিশেষ্য। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় তাই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ না আসাটা অসম্ভব।

'হিন্দু' তাই নামবাচক শব্দ থেকে পরিণত হয়েছে 'গুণবাচক' শব্দে অর্থাৎ বিশেষণে। কী সেই গুণ?

হিন্দু অর্থে বোঝায় এমন একটি সভ্যতার সূচনাকারী জাতি যারা বিজ্ঞানকে জীবনপদ্ধতির অংশ করেছে। আর বিশ্বকে ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে স্থান দেওয়ার, শিক্ষা দেওয়ার কাজ এখনো বাকি বিশ্বজননী ভারতবর্ষের।

এই 'নববর্ষ' কেন বিশেষভাবে 'হিন্দু নববর্ষ' তা বোঝা গেল কিন্তু এটি 'বিজ্ঞানের উৎসব' হয় কী করে?

আমাদের সকলের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো কালপঞ্জী। দৈনন্দিন জীবনে কালপঞ্জী ছাড়া একটি দিনযাপন কল্পনার বাইরে। আমরা বর্তমানে যে কালপঞ্জী ব্যবহার করি তাকে 'গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার' বলা হয় পোপ গ্রেগরির নামানুসারে। কিন্তু, এই ক্যালেন্ডারটি কি বিজ্ঞানসম্মত? ইংরেজিতে 'ডেকা' শব্দের অর্থ দশ কিন্তু 'ডিসেম্বর' বছরের দ্বাদশ মাস ; ইংরেজিতে 'অক্টো' কথার অর্থ আট কিন্তু অক্টোবর কি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস?

মাসের দিনসংখ্যা কখনো ৩০, কখনো ৩১, আবার কখনো ২৮ বা ২৯। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১ দিন কেটে জুলাই মাসে দেওয়া হয়েছিল রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আবদারে। আবার পরের মাস অগাস্টকে ৩১ দিনের করতে ফেব্রুয়ারি মাসেই কোপ মারেন অগাস্টাস সিজার। কোথায় বিজ্ঞান? কোথায় কোনো যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা? 'দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান' বা 'বিজ্ঞানমনস্কতা'র কয়েক পাতা জুড়ে রচনা পড়ানোর সময় দৈনন্দিন জীবনে এতো বড়ো অবৈজ্ঞানিকতা ছোটো থেকে আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

বিজ্ঞান খুঁজতে হলে দেখতে হবে ভারতীয় কালপঞ্জীকে। মাসের নাম বৈশাখ কেন ? কারণ সেই মাসে পূর্ণিমার চাঁদ থাকে বিশাখা নক্ষত্রে। উৎসবের নামের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় সেই দিনে চাঁদের দশা, যেমন— রামনবমী, গুরুপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা, শিবচতুর্দশী, অরণ্যষষ্ঠী। বছরের দিনসংখ্যা, মাসের দিনসংখ্যার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের পর্যাবৃত্ত গতির গাণিতিক গণনা আছে।

বহিরাগত শক্তিকে পরাজিত করে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করলেই কোনো জাতিকে 'স্বতন্ত্র' বলা যাবে না যতক্ষণ না তাঁর সমাজ তাঁর নিজের পদ্ধতিতে চলছে বা 'স্ব'-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে শিক্ষা ও পদ্ধতি নেওয়া যেতেই পারে কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার না করে নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব ইউরোপের কাছ থেকে নিয়েছি, সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো ইউরোপীয় বলেই। ইউরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত, সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেছি।'

কালগণনা একটি জাতির 'সভ্যতা' হিসেবে গণ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত। যে পুরাতন সভ্যতাগুলির ক্ষেত্রে কালগণনার কোনো ইতিহাস জানা যায়, তাদের মধ্যে এখন শুধুমাত্র ভারতবর্ষই টিকে আছে।

মায়া, ইনকা, মিশরীয় সভ্যতা এখন ইতিহাসের পাতাতেও হারিয়ে যেতে বসেছে। একটিমাত্র মত, একটিমাত্র পথ, একজনমাত্র উপাস্যের ধারণা থেকে জন্ম নেওয়া 'সিভিলাইজেশন'-এর ধারণা প্রাচীন সংস্কৃতির গভীরে লুকিয়ে থাকা বিজ্ঞানমনস্কতাকে বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি।

প্রাচীন ভারতের সম্পদশালী হওয়ার পেছনে দুটো কারণ ছিল— কৃষি ও বৈদেশিক বাণিজ্য। এই দুই ক্ষেত্রেই সফলতার জন্য একটি ভালো কালপঞ্জীর প্রয়োজন ছিল। কৃষিক্ষেত্রে বর্ষাকাল নির্ণয়ের জন্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে নেভিগেশনের জন্য। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিশালী অতীত প্রমাণ করে যে এই দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে ছিল। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া একটি ভালো কালপঞ্জী নির্মাণ করা সম্ভব হতো না, আর ভালো কালপঞ্জী ছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যক্ষেত্রে সফলতা অলীক কল্পনা ছিল। যদিও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা এই সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ কোনোদিন করেননি। তাইতো তাদের লেখায় বিশ্ব ভারতবর্ষের কাছে কতটা ঋণী তা প্রকাশ পায় না।

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। তাই অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ অনুযায়ী কালপঞ্জিকা পরিবর্তন করতে হয়, আর তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল।

মিশর থেকে গ্রিস আর গ্রিস থেকে রোমানরা যে ক্যালেন্ডার পেয়েছিল সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ইস্টারের সঠিক দিন নির্ণয়ে সমস্যা দেখা দিলে পোপ গ্রেগরি ক্যালেন্ডার সংশোধনে উদ্যোগী হন।

ইউরোপের বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী হওয়ার স্বপ্ন সঠিক নেভিগেশনের পদ্ধতি ছাড়া এতদিন অধরাই ছিল। নেভিগেশনের প্রথম পদক্ষেপ হলো সমুদ্রে অক্ষাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি জানা।

১৭০৭ সালে এক সামুদ্রিক অভিযানে ব্রিটেনের ২০০০ জন নিখোঁজ হয়ে যায়। ১৭১৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নেভিগেশনের সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। ভাস্কো-দা-গামা (Vasco da Gama) ও কলম্বাস (Columbus) তা জানতো না।

ভাস্কো-দা-গামাকে একজন ভারতীয় নাবিক কনক (Kanaka) সমুদ্র পথ দেখিয়ে ভারতে এনেছিলেন এবং কলম্বাস ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল। এই হচ্ছে সেই সময়কার ইউরোপের বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা!

তাই পোপ গ্রেগরির ক্যালেন্ডার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পেছনে অন্যতম কারণটি হলো সমুদ্রে সঠিক অক্ষাংশ নির্ণয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যে ইউরোপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু সেই ক্যালেন্ডার সংশোধনের জন্যেও যে গণিতের জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তার হদিশ ভারতবর্ষ থেকেই পেতে হয়েছিল পোপ গ্রেগরিকে, তার এক জেসুইট গুপ্তচর ক্লভিয়াসের মাধ্যমে।

স্বাধীনতার পর 'স্বতন্ত্রতা'র লক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয়, কিন্তু তার গতি ছিল মন্থর। ১৯৫২ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে Calendar Reform Committee গঠিত হয়। তার আগে ডঃ মেঘনাদ সাহা ১৯৩৯ সালে 'Science & Culture' পত্রিকায় "Need to Reform the Indian Calendar" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

১৯৫৭ সালের ২২ মার্চ, ভারত সরকারের নির্দেশে 'শক-সম্বৎ' (Saka Sambat)-কে ভারতবর্ষের জাতীয় ক্যালেন্ডার হিসেবে স্বীকার করা হয় এবং যে কোনো সরকারি নির্দেশ, পার্লামেন্টের আইন এ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের তারিখের সঙ্গে শক-সম্বতের তারিখ উল্লেখ করার আদেশ দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষে নক্ষত্রবর্ষ (Sidereal Year) ব্যবহার করে বিভিন্ন কালপঞ্জিকার প্রচলন আছে। এর মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে সৌর মাসের উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক কালপঞ্জিকা প্রচলিত। চান্দ্র মাসের উপর ভিত্তি করে দু'টি জনপ্রিয় কালপঞ্জিকা হলো বিক্রম সম্বৎ ও শক সম্বৎ।

বিক্রম সম্বতের সাল গণনা শুরু হয় উজ্জয়িনীর রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (যিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেছিলেন) সময় থেকে (৫৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আর শক সম্বতের গণনা শুরু হয় শক রাজত্বের সময় থেকে।

শকরা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। তারা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত ছিল। বিক্রমাদিত্য শকদের পরাজিত করার পর 'বিক্রম সম্বৎ' কালপঞ্জী শুরু করেন। তাই 'বিক্রম সম্বৎ' পদ্ধতির সঙ্গে ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাস জড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের জাতীয় ক্যালেন্ডার 'শকসম্বৎ'-এর প্রতি মাসের দিনসংখ্যার সঙ্গে চাঁদের দশার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত 'শকসম্বৎ'-এ ভারতীয়ত্বের ছোঁয়া নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে বিক্রম সম্বতের প্রতি মাসের দিনসংখ্যা চাঁদের দশার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ভারতবর্ষের প্রাচীন পদ্ধতি। আর বিক্রম সম্বৎ অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন চৈত্র শুক্ল প্রতিপদের সঙ্গে মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের মতো ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে।

তাই 'বিক্রম সম্বৎ'কে 'হিন্দু নববর্ষ' হিসেবে উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক জীবনপদ্ধতি ও অপরাজেয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

আধুনিক বিশ্বে 'বিজ্ঞান'কে সভ্যতার মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিলেও শুধুমাত্র যন্ত্রনির্ভরতাকেই বিজ্ঞানমনস্কতা হিসেবে মেনে নেওয়ার কারণ নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে পশ্চিম বিশ্ব এগিয়ে থাকলেও জীবনপদ্ধতিতে বিজ্ঞানকে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অনেক এগিয়ে আর তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হলো কালপঞ্জী। মৌলিক বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যার জন্য পশ্চিমি বিশ্ব ভারতবর্ষের কাছে ঋণী নয়।

এখন শুধুমাত্র ইউরোপ-আমেরিকার বৈভব যদি সবক্ষেত্রেই আমাদের পরাণুকরণে অভ্যস্ত করে তাহলে তা ভারতীয় হয়েও 'ভারতীয়ত্ব'কে চেনবার ব্যর্থতা।

এই 'হিন্দু নববর্ষ' উৎসবটি সারা পৃথিবীকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দানকে মনে করানোর উৎসব, ভারতের বিজ্ঞানসাধনার উদ্‌যাপনের উৎসব। ভারতীয় উৎসবগুলোর প্রতিটির পিছনে 'বিজ্ঞান' রয়েছে কিন্তু 'হিন্দু নববর্ষ' বিশেষভাবে 'বিজ্ঞানের উৎসব'।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে 'হিন্দু নববর্ষ' বা 'বর্ষপ্রতিপদ' উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সনাতনী প্রবৃত্তিকেই সদাজাগ্রত রাখতে চায় যা ভারতীয় হিসেবে আমাদের বিজ্ঞান সাধনা ও উৎসবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জীবনপদ্ধতিকে প্রচারিত করার প্রয়াস। □

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং বঙ্গপ্রদেশ

অধ্যাপক বাপ্পা মহন্ত

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের নানা প্রান্তের অসংখ্য দুঃসাহসী তরুণ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অগ্নিযুগের ভারতমাতার বীর সন্তানরা বহু কষ্ট, ত্যাগ, বহু অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাঁরা আন্দামানে সেলুলার জেলে নির্বাসন-জীবনে ইংরেজের অমানবিক অত্যাচার থেকে শুরু করে, সংসার, পরিবার- পরিজন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবকিছু ত্যাগ করে স্বদেশি চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দেশমাতৃকার চরণে নিজেদের জীবন তাঁরা উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র, বঙ্গ, পঞ্জাব, দক্ষিণভারত-সহ দেশ জুড়েই সর্বত্রই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জোয়ার আসে। ভারতের বাইরেও বিপ্লবীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিপ্লবীর কথাই সেভাবে ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উঠে আসেনি। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জীবনকথা আলোচনা করা যেতে পারে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার একজন জন্মজাত দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সদস্য ডাঃ হেডগেওয়ার বঙ্গভূমি থেকেই বৈপ্লবিক কাজের প্রেরণা পেয়েছিলেন। বাল্যকালেই দেশপ্রেমের বীজমন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' থেকে প্রেরণা পান। বঙ্গের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের কথাই ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের। শৈশবেই তিনি তাঁর মাতা-পিতাকে হারান। খুব অল্প বয়সেই তাঁর মনে দেশভক্তির স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। নীলসিটি হাইস্কুলে ভর্তি হবার পর ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবনী, লোকমান্য তিলকের 'কেশরী' সংবাদপত্র প্রভৃতি বালক কেশবের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মাত্র আট বছর বয়সে রানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্কুলে বিতরণ করা মিষ্টির প্যাকেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে বালক বলেছিল, --- 'ও কি আমাদের রানি?' আফ্রিকার 'বুয়র যুদ্ধ' থেকে নাগপুরে ফিরে আসা ডাক্তার বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জের প্রভাবে যুবক কেশব রাষ্ট্রীয় মনোভাবসম্পন্ন বন্ধুদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় চিন্তা জাগরণের কাজ শুরু করেন। এরসঙ্গে চলে গুপ্ত বৈঠক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার ঢেউ মহারাষ্ট্রের মাটিতে আছড়ে পড়েছিল। সেই সূত্রেই বিপ্লবের অগ্নি তাঁর মনে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন দেশের সকল প্রান্তকে একসূত্রে গেঁথে ফেললো।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্র ধরে কেশব হেডগেওয়ারের পথচলা নতুন বাঁক নিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' জনমনে যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের মাধ্যমে একটি দিনেই সম্পূর্ণ জনতা দেশভক্তির দীক্ষা লাভ করে। বন্দে মাতরম্ মন্ত্র নাগপুরের মাটিতেও গুঞ্জিত হতে লাগলো। দশম শ্রেণীর ছাত্র কেশবের নেতৃত্বে ছাত্ররা স্কুলে আগত ইন্সপেক্টরকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তার জন্য স্কুল থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। পরে যবৎমল জাতীয় বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিপ্লবের পীঠস্থান বঙ্গভূমিতে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। সময়টা ছিল ১৯১০ সাল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করা।

বঙ্গপ্রদেশের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী আন্দোলনের সংযোগ কিন্তু আগেই শুরু হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা উড্ডীন করেন। ১৮৯৩ সালেই

মরাঠা যুবকরা গুপ্ত সমিতির বীজ বপন করেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই বছর ভারতে ফেরেন। তিনি বরোদার মহারাজার অধীনে কর্ম নিয়ে আসেন। তিনিও বঙ্গে গুপ্ত সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৮৯৪-১৮৯৫ সালে তিলকের অধিনায়কত্বে গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উৎসব শুরু হয়। চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি, সাভারকর ভ্রাতাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করলো। ১৯০২ সালে ব্যারিস্টার পি মিত্র স্থাপন করলেন অনুশীলন সমিতি। ১৯০৬ সালে বঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করার জন্য কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠিত হলো।

শিবাজী উৎসবকে কেন্দ্র করে বালগঙ্গাধর তিলক, খপার্ডে, এম এস মুঞ্জে প্রমুখ মরাঠা নেতৃত্বের সঙ্গে বঙ্গের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল। সেই সময় মহারাষ্ট্রের কিছু যুবক কলকাতায় এসেছিলেন ডাক্তারি পড়তে। বিপ্লবী নলিনী কিশোর গুহ তাঁর রচিত 'বাংলার বিপ্লববাদ' বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ''১৯৫৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রিতে লেখকের কলকাতার বাড়িতে পুরাতন মরাঠি বন্ধু ডাক্ত এথালে, (Dr.V.V. Athalye, A.V.P-Saraswati Sadan Satata City) লেখকের খোঁজে আসেন। এই সাক্ষাৎকার ৪৪ বছর পরে। প্রথমে লেখক ঠিক চিনতে পারেননি। ১৯০৯ সাল, ১৭ নং বৌবাজার স্ট্রিট, মহারাষ্ট্র লজ, গণপতি উৎসব প্রভৃতি উল্লেখক্রমে সব কথাই স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। ১৯০৮-০৯ সালে মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র (কলিকাতায় ডাক্তারি পড়িতেন) জন কয়েকের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ ঘটে। এথালে, পিমপুতকর প্রমুখ বিপ্লবী দলভুক্ত হন। তাঁরা সাঁতারায় বিপ্লবী দল গড়ার চেষ্টা করেন। ১৯১০ সালে গরমের ছুটিতে এথালে সাঁতারায় যান। কিন্তু কিছুকাল পরেই গ্রেপ্তার হন সাঁতারা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামিরূপে।' এই বর্ণনা দেবার একটাই কারণ সেটি হলো, কেশব হেডগেওয়ার হঠাৎ করে কোনো যোগাযোগ ছাড়া সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে ডাক্তারি পড়তে কলকাতা এসে বিপ্লবী দলে যোগদান করলেন তেমনটা নয়। বঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সংযোগসূত্র ধরেই তিনি কলকাতায় আসেন। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' শীর্ষক বইয়ে উল্লেখ করেছেন এই ভাবে , ''বীর সাভারকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর, ডাঃ এথালে (সাতারা) এবং আরও কিছু মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবক ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। কেশব হেডগেওয়ার তখন অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। 'বাংলার বিপ্লববাদ' পুস্তকের লেখক শ্রীনলিনী কিশোর গুহ ওই সময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, তিনি তাঁহাদিগকে দলে টানিয়ে আনেন। আমার পলাতক অবস্থায় আমি ২/১ বার তাঁহাদের ছাত্রাবাসে ছিলাম।''

অবিভক্ত বঙ্গের মাটির সঙ্গে ডাক্তারজীর সম্পর্ক কতটা গভীর সে কথা জানতে পারি বিপ্লবী জীবনতারা হালদার রচিত 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে। বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ''অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে অবিলম্বেই ভিতরের গোষ্ঠীতে প্রবেশের অধিকার পেলেন তিনি। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী দাস, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন কেশব।'' তাঁর ছদ্মনাম ছিল কোকেন। অনুশীলন সমিতির ভিতরের গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার অধিকার এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সেই অধিকার অর্জন নির্দিষ্ট সংখ্যক বিপ্লবীর ছিল বলে মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও ডাক্ত হেডগেওয়ারের সংযোগ তৈরি হয়েছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নির্দেশ মতো নরনারায়ণ সেবায় অনুশীলন সমিতি আত্মনিয়োগ করেছিল। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সন্ন্যাসী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৩ সালে দামোদরে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল। ডাক্ত হেডগেওয়ার রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির অন্যান্য সভ্যদের নিয়ে বন্যাকবলিত মানুষের জন্য ত্রাণকাজে যোগ দেন। সমাজ সেবা ও জনসেবার অভিজ্ঞতা ডাক্ত হেডগেওয়ার বঙ্গভূমি থেকেই সঞ্চয় করেছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ডাঃ হেডগেওয়ারের সাক্ষাৎ পর্ব সম্পর্কে অনেকেই কম-বেশি জানেন ও পড়েছেন। এই বিষয়ে অনেক লেখক-গবেষক বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রপত্রিকায় বিষয়টি আলোচনা করেছেন। দু'জনের বয়সের পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' পুস্তকের লেখক বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, ''১৯১৩ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি মেডিক্যাল ছাত্রদের মেসে। ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মেডিক্যাল ছাত্র ছিলেন। তাঁর একটি ছেলে ধরার আড্ডা ছিল। উদ্দেশ্য মহৎ। ভবিষ্যৎ দেশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো। সুরেশবাবু সুভাষচন্দ্রকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।'' আসলে সুভাষচন্দ্র সেই সময় সবে ম্যাট্রিক পাশ করে কটক থেকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সম্ভবত এর কিছু সময় আগে কলকাতায় মেডিক্যাল ছাত্রদের মেসেই বিপ্লবী যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনুশীলন সমিতির প্রথম সারির বিপ্লবীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংযোগ তৈরি হয়েছিল। আর ডাঃ হেডগেওয়ার এর ঠিক প্রায় তিন বছর আগে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসে পুরো মাত্রায় অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনিও মেডিক্যাল ছাত্রদের মেসেই থাকতেন। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় দু'জনের অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র এবং ডাঃ হেডগেওয়ারের সাক্ষাৎকারের বিষয় সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে সঠিক গবেষণার মাধ্যমেই।

বিপ্লবী জীবনতারা হালদারের বর্ণনায় ''ডাঃ হেডগেওয়ার ১৯১৬ সালে ডাক্তারি পাশ করে নাগপুরে ফিরে গিয়ে তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন এবং ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার জন্যে কারাদণ্ড হয় তাঁর। এই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফতকে জড়ানো নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ হলো। ডাঃ হেডগেওয়ারের

প্রশ্ন ছিল, ভারতের জাতীয়তা বলতে কী বোঝায়? আমাদের জাতীয় চরিত্রে শৃঙ্খলা ও সংহতির বোধ কোথায়! দেশ কেন পরাধীন হলো? স্বাধীনতা লাভের পর দেশ গড়তে হলে যে গঠনমূলক কর্মসূচির প্রয়োজন কংগ্রেস নেতাদের মাথায় তা নেই কেন? এসব চিন্তা নিয়েই ১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীর দিন নাগপুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।" বিজয়াদশমীর দিন সঙ্ঘের দুটি বিষয়ই বীজরূপে নিশ্চিত হয়েছিল। প্রথম, হিন্দুরাষ্ট্রের পুনরুত্থানের বিষয়ে ডাক্তারজীর মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দ্বিতীয়, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সমর্পিত ডাক্তারজীর চারিত্র্যপূর্ণ, ধ্যেয়নিষ্ঠ ও সেবাময় জীবন।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরেও ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে বঙ্গের যোগাযোগ অটুট ছিল। ১৯৮৯ সালে এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'Manthan' জার্নালে এক প্রবন্ধে উল্লেখ আছে, ''Subhas Bose and Dr. Hedgewar had first met at Calcutta session of Congress, 1928।" সেই প্রবন্ধে আরো উল্লেখ রয়েছে , ''In, 1938, Bose as a Congress President was visiting Nagpur. He wanted to see Dr. Hedgewar– but the provincial congress committee said 'NO'.'' এরপর ১৯৪০ সালের প্রথমদিকে বিপ্লবী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী নাগপুরে ডাঃ হেডগেওয়ারের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। এই সাক্ষাতের কথা বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর লেখা বই 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' -এ ঘটনার উল্লেখ লেখক নিজেই দিয়েছেন। সে সাক্ষাতে সুভাষচন্দ্র বসুর কথাও বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ ডাঃ হেডগেওয়ারকে বলেছিলেন। এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে অনেকের মনে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হবে। সেটি হলো কে এবং কার নির্দেশে হঠাৎ করে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ ডাঃ হেডগেওয়ারের নাগপুরের বাড়িতে দেখা করতে যান। একটি বিষয় অনেকেই অবগত যে, সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ভারতবর্ষব্যাপী জাগরণ তৈরি করার লক্ষ্যে কিছু নেতার কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করেই ত্রৈলোক্য মহারাজ পুরনো বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। লক্ষ্য ছিল একটাই ভাবী বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি লাহোরে ডাঃ সত্য পাল, হামিরপুর জেলার একদা আন্দামান জেলে বন্দি বিপ্লবী পণ্ডিত পরমানন্দ প্রমুখ বিপ্লবীর বাড়ি গিয়ে দেখা করেন। তারপরেই তিনি নাগপুরে গিয়ে ডাক্তা হেডগেওয়ারের ছোট বাড়িতে বসে দু'জনের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্রে ফিরে যাবার দুই যুগ পার হবার পরেও অনুশীলন সমিতির দুই বিপ্লবীর সম্পর্ক, ভালোবাসা ও আত্মীয়তা কতটা গভীর হতে পারে দু'জনের কথোপকথন থেকেই তা পরিষ্কার অনুভব করা যায়। এই ঘটনার কয়েক মাস পর অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ২০ জুন ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে 'Manthan', Vol. X, NO. 4, April, 1989' মাসিক জার্নালে উল্লেখ আছে , ''On June 20 1940, Bose came with Forward Bloc leader Ruikar to see the dying Hedgewar. But after a restless night Hedgewar had just gone to sleep. Subhas asked not to wake him up– folded his hands in 'Pranam', and left. A few moments later Dr.Hedgewar woke up. When he was told that Bose had called, he set up, uttered the word "Subhas" with great affection and did pranam. Next day he passed way.'' এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য হলো, রাকেশ সিনহা তাঁর 'Builders of Modern India– Dr. Keshav Baliram Hedgewar' শীর্ষক ইংরেজি বই লেখেন। এই বইটি ২০১৫ সালে ভারত সরকারের Ministry of Information and Broadcasting প্রকাশ করেছিল। এই বইয়ের ১৬ নং পাতায় Hitvada, 23 June, 1940 থেকে তথ্যসূত্র উল্লেখ করে লেখক লিখেছেন, ''Actually, when he was on his deathbed, Subhas Chandra Bose came to meet him on June 20, 1940. He sat for a while at Dr. Hedgewar's side, and left after paying him obeisance."

১৯৪০ সালের ২১ জুন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার পরলোকগমন করেন। ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে ঋষি অরবিন্দ, গান্ধীজী, বীর সাভারকর, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন শতবর্ষের চৌকাঠ পার করলো। এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর কর্মকাণ্ডের পেছনে প্রেরণা নিশ্চিতভাবেই বঙ্গভূমি থেকেই পেয়েছিলেন। আর সেই অনুপ্রেরণা বন্দে মাতরম্, অনুশীলন সমিতি কিংবা রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে আসুক না কেন। অনুশীলন সমিতির মধ্যে যেমন শারীরিক ও বৌদ্ধিক ব্যবস্থা ছিল, সঙ্ঘের সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও সেটা প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার সমাজসেবা, নরনারায়ণ সেবা, এবং দুঃস্থের সেবাকাজ করার প্রথম অভিজ্ঞতা ডাঃ হেডগেওয়ার স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপিত রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে প্রেরণা পাবার বিষয়টিও অসম্ভব নয়। একথাও ঠিক যে, প্রাদেশিকতা ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক সমরসতা ও ব্যক্তি নির্মাণের কাজ ডাঃ হেডগেওয়ার করে গেছেন আজীবন। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী ওয়ার্ধাতে সঙ্ঘের শিবির পরিদর্শন করেছিলেন। ডাঃ হেডগেওয়ার গান্ধীজীকে বলেছিলেন, 'ম্যান মেকিং ইজ মাই মিশন'। আত্মপ্রচার বিমুখ ডাঃ হেডগেওয়ার কোনো দিনই নিজের প্রচার করেননি। তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন নিঃস্বার্থভাবে দেশের কল্যাণে ও হিতসাধনে।

আগামীদিনে সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ডাঃ হেডগেওয়ার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ নিয়ে অনেক আলোচনা, গবেষণা ও লেখালেখি হবে নিশ্চিতভাবেই। সেই পথ ধরেই বঙ্গ তথা বাঙ্গালির সঙ্গে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী ডাঃ হেডগেওয়ারের গভীর সম্পর্ক ছিল সেই ইতিহাস আরও বিস্তারিত উঠে আসবে ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে। আর সেই চর্চা হবে তথ্যের আলোকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই।

‘অসাংবিধানিক নয়’ : ছত্তিশগড় হাইকোর্টের ‘যাজকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার হোর্ডিঙের বৈধতা বহাল সুপ্রিম কোর্টেও’

নিবন্ধন নম্বর : ৭৯। তারিখ : ০৯.১০.১৯৫৬
অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম
জশপুর নগর, ছত্তিশগড়— ৪৯৬৩৩১
ক্যাম্প মহীশূর, কর্ণাটক
ইমেইল : kalyanashram1952@gmail.com।
তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় আইন— ‘দ্য পঞ্চায়েতস্ (এক্সটেনশন টু দ্য শিডিউলড্ এরিয়াস্) অ্যাক্ট, ১৯৯৬’ বা পেসা অনুযায়ী গঠিত গ্রামসভাগুলির সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি

বনবাসী কল্যাণ আশ্রম সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে দিগ্বল টান্ডি বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম স্বাগত জানাচ্ছে। এই রায়ে ছত্তিশগড়ের উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির বোর্ড লাগানোর ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রামসভার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা একটি আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট ছত্তিশগড় হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছে। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল যে, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে ধর্মান্তরণ রোধে হোর্ডিং বা বোর্ড লাগানোর পদক্ষেপকে অসাংবিধানিক বলা যাবে না। হাইকোর্ট উল্লেখ করেছিল যে, খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রলোভন ও কারসাজির মাধ্যমে উপজাতি জনগোষ্ঠীর ধর্মান্তর ঘটায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর এই রায়ে সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট করেছে যে, ‘পেসা’ আইনের অধীনে গ্রামসভাগুলোর তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

ছত্তিশগড় হাইকোর্ট আগেই গ্রামসভাগুলির এই সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে গণ্য করেছিল এবং তাদের রায়ে উল্লেখ করেছিল যে, গ্রামসভাগুলো কেবল আনুষ্ঠানিক সংস্থা নয়, বরং প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনের একক। ছত্তিশগড় রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং পঞ্চায়েতি রাজমন্ত্রী শ্রীবিজয় শর্মা স্পষ্ট করেছেন যে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সাংবিধানিক আদর্শ এবং উপজাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছে। তিনি জানান, ছত্তিশগড় সরকার গ্রামসভাগুলোর অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং পেসা আইনে বর্ণিত নিয়মগুলোকে আরও কার্যকর করার কাজ চলছে যাতে উপজাতীয় সমাজ তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ছত্তিশগড় সরকারের এই দৃঢ় ভূমিকার জন্য তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। একইভাবে এই সংগঠনে তফশিলি এলাকার অন্তর্গত সকল ১০টি রাজ্যের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে যাতে তারা ‘পেসা’ আইনের মূল ভাবধারাকে মাথায় রেখে নিজস্ব রাজ্যে কঠোর নিয়ম তৈরি করে এবং মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্দেশিকা জারি করেন। এর ফলে জনজাতি সমাজ তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ও পূজা পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে।

(সত্যেন্দ্র সিংহ)
সভাপতি, অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম।

প্রতিটি কৃষকের ঘরে রাখার মতো পুস্তক

সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। খ্রিস্টজন্মের ৮০০০-৪০০০ অব্দ থেকে কৃষিকাজের প্রমাণ রয়েছে। অতি প্রাচীনকালেও ভারতীয় কৃষকরা উন্নত চাষ ও সেচ পদ্ধতির বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন। ভারতীয় কৃষির ইতিহাস সুপ্রাচীন। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে কৃষির উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে বহু কৃষি বিষয়ক শ্লোক রয়েছে। তাতে চাষের লাঙ্গল, বপন সার, ফসল ও কর্তন এবং সেচ সম্পর্কিত কথা রয়েছে। আবার ইন্দ্র, পূষন্, ক্ষেত্রপতি এবং বৃষ্টির দেবতারও উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালেও কৃষিই দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছিল। ভারতবর্ষে কৃষি জীবিকা নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গও বটে। ধান, পাট, আখ, তুলা, গম, চা এবং নানারকম শাকসবজি ভারতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিশেষ করে ধানকে মা লক্ষ্মীরূপে পূজা করা হয়। কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দেন। তাই আজও তাদের অন্নদাতা বলে সম্মান জানানো হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে ইংরেজরা সবকিছুর সঙ্গে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলেছিল।

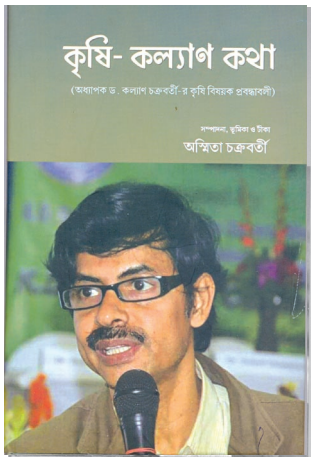

স্বাধীন ভারতে দেশের কৃষিক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমান ভারত সরকারের কৃষকদের উন্নয়নের জন্য পি-এম কিষাণ-সহ বিভিন্ন প্রকল্প ও কৃষিঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের কৃষিকাজে উৎসাহিত করে চলছে। ২০২২-২৩ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী এখন দেশে ৪৫.৭৬ শতাংশ মানুষ এখনও কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। অনেক কৃষিগবেষক হাতেকলমে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, মাত্র ২-৩ বিঘা বা তার চেয়ে কম জমিতেও কৃষিকাজের মাধ্যমে একটি ছোটো পরিবারের অন্নসংস্থান সম্ভব। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুর্দশন আধুনিক ও নিবিড় কৃষিকাজে সব সময় উৎসাহ প্রদান করতেন। তিনি দেশের বড়ো বড়ো শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের ছাদবাগান করার উৎসাহ দিয়েছেন। ভোপাল সঙ্ঘ কার্যালয়ের ছাদে প্রতিদিন ১০/১৫ জনের শাকসবজি উৎপাদনের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। যা বহু মানুষকে উৎসাহিত করে চলেছে। কৃষিবিজ্ঞানী বশীশ্বর সেনের নাম আমরা জানি। তিনি ভারতে সবুজ বিপ্লবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর মতো বহু মানুষ কৃষি গবেষণাকে জীবনে ধ্যেয় করেছেন।

এক্ষেত্রে আমরা বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ড. কল্যাণ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেও কৃষি গবেষণা ও কৃষিকাজে উৎসাহ দান করে কৃষকদের মানোন্নয়নকে নিজের জীবনের সাধনা করে রাজ্যের সর্বত্র কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে হাতে কলমে সমন্বিত কৃষি-উদ্যান পালনে উৎসাহিত করে চলেছেন। তিনি কৃষি বিষয়ক বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন। তার কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীকে কেন্দ্র করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা অস্মিতা চক্রবর্তী গত বছর ‘কৃষি-কল্যাণ কথা’ নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এই প্রতিবেদক কৃষক-সন্তান হওয়ার কারণে মনে হয়েছে, এরকম একটি গ্রন্থ বঙ্গভাষী প্রতিটি কৃষকের হাতে থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থটিতে ২১টি অধ্যায়ে বঙ্গপ্রদেশের আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে কৃষি ও কৃষি বাস্তুতন্ত্রের বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। বঙ্গকৃষির বারোমাস্যা অধ্যায়ে প্রতিটি মাসে কৃষিচর্যার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। একই ভাবে ফলচাষ, ডালচাষ, ফুলচাষের মতো বিষয়গুলিকে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। সুন্দর প্রচ্ছদ, নির্ভুল বানান সমন্বিত পুস্তকটি কৃষকের ঘরে ঘরে রাখার মতো। কৃষক ও কৃষিপ্রেমী পাঠকদের হাতে কৃষিজ্ঞান-সমৃদ্ধ এরকম একটি পুস্তক তুলে দেওয়ার জন্য সংকলন-কর্ত্রী অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য।

পুস্তকের নাম : কৃষি-কল্যাণ কথা। সম্পাদনা : অস্মিতা চক্রবর্তী। প্রকাশনা : কবিতিকা। মূল্য : ৫০০/- টাকা।

আহমেদাবাদের পুনর্জন্ম ঃ ত্রিমুকুট জয়ে ইতিহাস গড়লো টিম ইন্ডিয়া

নিলয় সামন্ত

অতীতের মনখারাপের সব ধুলো ঝেড়ে ফেলে গত ৮ মার্চ আহমেদাবাদের মাঠেই ভারতীয় ক্রিকেটের এক সোনালি অধ্যায় রচনা করল টিম ইন্ডিয়া। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপ এবং টি-২০ বিশ্বকাপ; মাত্র তিন বছরের মধ্যেই ভারতের মাথায় উঠল ত্রিমুকুট। যেন এক অপূর্ণ বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো ঠিক সেই আহমেদাবাদেই, যেখানে কিছুদিন আগেই হতাশার গভীর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট।

২০২৩-এ একদিবসীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট (ওডিআই) বিশ্বকাপের ফাইনালে এই মাঠেই অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গিয়েছিল ভারত। সেদিন গোটা দেশ যেন বিশ্বাসই করতে পারেনি যে ৫০-৫০ ওভারের ক্রিকেটে গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে এতটা অপ্রতিরোধ্য একটি দল ফাইনাল ম্যাচে হেরে যেতে পারে। তবু পরাজয়ের সেই রাতে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা টিম ইন্ডিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন নিঃশর্ত ভালোবাসা নিয়ে। সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাসেরই যেন প্রতিদান দিল সূর্যকুমারদের দল। আজ আহমেদাবাদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ভাসছে গোটা দেশ।

ভারতে 'ক্রিকেট' শুধুমাত্র একটি খেলা নয়। এ যেন এক আবেগ, এক ধর্ম, এক অদৃশ্য বন্ধন। সমুদ্রের ধারে থাকা কেরালার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে হিমালয়ের কোলে থাকা কাশ্মীর; এই বিশাল দেশটাকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে ক্রিকেট। এই খেলাই কোটি মানুষের স্বপ্ন, আনন্দ আর আবেগের এক মহাকাব্য। তাই জয় যেমন আনন্দের ঢেউ তোলে, তেমনি পরাজয় আনে গভীর অভিমান। কিন্তু আজ সব অভিমান ধুয়ে মুছে গেছে আনন্দাশ্রুর জোয়ারে।

ফাইনালের দিন নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের মাঠে যেন হঠাৎ জেগে উঠেছিল এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। সেই আগ্নেয়গিরির নাম 'অভিষেক শর্মা'। এদিন তাঁর ব্যাট থেকে ছুটে বেরোয় কিছু আগুনঝরা শট। অন্যদিকে সঞ্জু স্যামসনের ব্যাট ছিল কোটি কোটি উদ্বিগ্ন হৃদয়ের ভরসা। বোলিং বিভাগে জসপ্রীত বুমরার ঠান্ডা মাথার নেতৃত্ব সমর্থকদের পাহাড়প্রমাণ প্রত্যাশাকে আগলে রেখেছিল। ঈশান কিষাণের দুরন্ত ক্যাচ এবং অক্ষর প্যাটেলের নিখুঁত বোলিং ম্যাচটাকে অনেকটাই ভারতের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়।

পুরোনো ইতিহাসকে ছুঁড়ে ফেলে এদিন নতুন ইতিহাস লিখল ভারত। অতীতে কোনও আয়োজক দেশ টি-২০ বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। ভারত সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখাল। আবার অতীতে কোনও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নিজের ঘরের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ ধরে রাখতে পারেনি। সেই নজিরও গড়ল ভারত। এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়া যেন সমস্ত পরিসংখ্যান আর হিসেবনিকেশের গণ্ডির বাইরে চলে গেছে।

ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের সামনে ছিল ২০ ওভারে ২৫৫ রানের বিশাল লক্ষ্য। কিন্তু এত বড় চাপ নিতে গিয়ে মাঝপথেই ভেঙে পড়ল কিউই ব্যাটিং লাইনআপ। একের পর এক উইকেট পড়তে থাকে। ফলে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় দেখা যায়নি বললেই চলে। শেষ পর্যন্ত একপেশে লড়াইয়ে ৯৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নেয় সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল।

এই জয়ের নেপথ্যে বিশেষ করে দুই ব্যাটসম্যানের নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে— ঈশান কিষাণ ও সঞ্জু স্যামসন। তাঁরা শুধু ম্যাচ জেতায়নি, তাঁরা ভারতের কাছে এনে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, প্রত্যাঘাত এবং স্বপ্নের অগণিত মুহূর্তকে। তাঁদের ব্যাট থেকে ছুটে আসা প্রতিটি রান যেন নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য এক বার্তা দিয়ে গেল; প্রত্যাবর্তন অসম্ভব নয়, সুযোগ পেলে যে কেউ নিজের ভাগ্য বদলে দিতে পারে।

বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের পরিকল্পনা কিন্তু একেবারেই আলাদা ছিল। শুভমান গিল যে টি-২০ বিশ্বকাপে খেলবেন, তা ছিল কার্যত নিশ্চিত। এমনকি তাঁকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে ভারতের টি-২০ দলের অধিনায়ক হিসেবেও তাঁর নাম আলোচনায় ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে গিলের হতাশাজনক পারফরম্যান্স টিম ম্যানেজমেন্টকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। শেষ মুহূর্তে তারা বিকল্প খুঁজতে শুরু করে। তখনই নজরে আসে প্রায় বিস্মৃত এক নাম— ঈশান কিষাণ। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে তিনি কার্যত একাই ঝাড়খণ্ডকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। সেই পারফরম্যান্সই আবার তাঁকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে সুযোগ পান তিনি। অন্যদিকে সঞ্জু স্যামসন ছিলেন ১৫ জনের স্কোয়াডে। কিন্তু প্রথম একাদশে তাঁকে খেলানোর কথা ভাবেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষ টি-২০ সিরিজে একের পর এক কম রানে আউট হওয়ায় তাঁকে মূলত বিকল্প উইকেটকিপার হিসেবেই রাখা হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য কখন কোথায় বদলে যায়, তা কেউ জানে না। একটা মাত্র সুযোগ পেয়েই যেন বদলে গেল সবকিছু। অভিষেক অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলে সুযোগ পান সঞ্জু। প্রথম ম্যাচে অবশ্য তাঁকে ডাগ-আউটে বসেই থাকতে হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নেমে তিনি খেলেন বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকরী ইনিংস। সেই ইনিংসই যেন তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়।

অভিষেকের ফর্ম তখনও ফিরছিল না। ফলে সঞ্জুর সামনে আবার সুযোগ আসে। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। টুর্নামেন্ট যত এগিয়েছে, ততই তাঁর ব্যাট কথা বলেছে। বড় ম্যাচে বড় ইনিংস খেলেই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, চাপের মুহূর্তে তিনিই দলের ভরসা। ভারতের এই বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে অবশ্যই গোটা দলের অবদান রয়েছে। তবু ঈশান কিষাণ এবং সঞ্জু স্যামসনের জুটির অবদান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। তাঁরা যেন হঠাৎ কোথা থেকে এসে পুরো টুর্নামেন্টের গল্পটাই বদলে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা থেকেই যায়— এই জুটি কোথা থেকে এলো, কীভাবে এলো, আর কীভাবেই বা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম লিখে রেখে চলে গেল? তবে হয়তো ক্রিকেটের সৌন্দর্যই এখানেই। অপ্রত্যাশিত মুহূর্তেই জন্ম নেয় সবচেয়ে বড় গল্প। আর সেই গল্পই একদিন হয়ে ওঠে ইতিহাস। □

নবাঙ্কুর

কলাবাগানে আলো

নীলু তখন ক্লাস এইটে পড়ে। পড়াশোনায় যেমন ভালো, দুষ্টুমিতেও তেমনই সবার আগে। তার ওপর যেমন সাহসী, তেমনই বুদ্ধিমান। ক্লাসের পড়ার বাইরেও অনেক বই পড়ে। ওর জানার আগ্রহ খুব বেশি। সেজন্য ওর অনেক বন্ধু। সেই বন্ধুদের নিয়ে যে কত লোকের গাছ থেকে আম, জাম, তেঁতুল পেড়ে খেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। তখন বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ। প্রচণ্ড গরম। সেই কবে থেকে বৃষ্টি হয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় পড়তে বসে রেডিয়োর খবরে নীলু শুনতে পেল, আগামীকাল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হবে। শোনামাত্র সে তো আনন্দে আত্মহারা। কতদিন হয়ে গেল বৃষ্টি নেই। এবার গাছপালা, পশুপাখি সব স্বস্তি পাবে। তাছাড়া এই ভেবে খুশি হচ্ছিল যে, ঝড়ে বন্ধুদের নিয়ে অনেক আম কুড়ুবে।

পরদিন নীলুর বন্ধুরা এই খবর শুনে খুব খুশি। শঙ্কর বলল, সেই-ই সবার আগে নীলুর সঙ্গে বাগানে যাবে। কিন্তু সারাদিন কেটে গেল, বৃষ্টি তো দূরের কথা, আকাশে এক টুকরো মেঘও দেখা গেল না।

তার পরদিন নীলু সন্ধ্যায় পড়তে বসেছে, তখনই জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া দমকা ঘরে প্রবেশ করে তার বই-খাতা লণ্ডভণ্ড করে দিল। নীলু বুঝতে পারল ঝড় উঠেছে। জানালা বন্ধ করে দিয়ে ছুটে সে নীচে নেমে এল। এক দৌড়ে নীলু শঙ্করদের বাড়ি গিয়ে ওকে নিয়ে বাগানে ছুটল। একটু পরেই নীলুর বন্ধুরাও এসে হাজির হলো।

সবাই মিলে আম কুড়ুতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ঝড়ের গতি কমে এল। আর তখনই প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তাদের আম কুড়ুনো প্রায় শেষ, হঠাৎ নীলু দেখতে পেল, কাছেই কলাবাগানের একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। নীলু শঙ্করকে ডেকে আলোটা দেখাল। শঙ্কর এমনিতে খুব ভীতু। আলোটা দেখেই ওর অবস্থা কাহিল। নীলু ভূত-প্রেতে বিশ্বাস না করলেও একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে সবাই নীলুকে জড়িয়ে ধরল।

আমবাগানে যে এসব কাণ্ড হচ্ছে, তা তো বাড়িতে কেউ জানে না। এদিকে বাড়িতে নীলুর মা'র হঠাৎ খেয়াল হলো যে নীলু ঘরে নেই। তখনই নীলুর মা বাড়ির সবাইকে নিয়ে বাগানে এসে হাজির হলেন। তারা সবাই দেখলেন নীলুকে জড়িয়ে ধরে সবাই থরথর করে কাঁপছে। নীলুর মা ছুটে ওদের কাছে গেলেন কিন্তু ওরা কোনো কথা না বলে শুধু ইশারায় কলাবাগানের দিকে দেখিয়ে দিল। বৃষ্টির মধ্যে কলাবাগানের আলো জ্বলতে দেখে সবাই খুব ভয় পেয়ে গেলেও নীলুর বাবা সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন সেখানে একটি এলইডি বাল্ব পড়ে আছে আর সেটাই জ্বলছে। নীলুর বাবা অবাক হয়ে সবাইকে ডাকলেন কিন্তু বলতে পারলেন না বাল্বটি বৈদ্যুতিক তারের সাহায্য ছাড়াই কীভাবে জ্বলছে। যাই হোক, সবাই বাড়ি ফিরে এল।

নীলু আর তার বন্ধুদের মাথায় ওই বিষয়টাই ঘুরছিল যে বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়া বাল্বটা কীভাবে জ্বলছিল। পরদিন স্কুলে ভৌতবিজ্ঞানের ক্লাসে নীলু স্যারকে ওই কথাটি জিজ্ঞেস করল। সব শুনে স্যার বললেন, এটা তো একটি স্বাভাবিক বিষয়। এখন এই প্রযুক্তিতে অনেক পরিবেশবান্ধব এলইডি লাইট তৈরি হচ্ছে। ওই বাল্বটি খারাপ ভেবে কেউ কলাবাগানে ফেলে দিয়েছিল। বৃষ্টির জলে লবণের কণা আর ভিজে পাতা অ্যাসিড আয়ন হিসেবে কাজ করে বিদ্যুৎ তৈরি করেছিল। তার ফলেই বাল্বটি জ্বলছিল। স্যারের মুখে সব শুনে নীলুর চিন্তা দূর হলো।

নবাঙ্কুরের বন্ধুরা, ভূত-প্রেত বলে কিছু হয় না, এসবই মনের ভুল। যেসব ঘটনাকে অনেক সময় মানুষ ভৌতিক কাণ্ড বলে ভুল করে, নিশ্চয়ই তার পেছনে কোনো বিজ্ঞান কাজ করে। কলাবাগানের আলো তারই একটি উদাহরণ।

শ্রেষ্ঠা দত্ত, দশম শ্রেণী, অভিরামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

জাতীয় উদ্যান

সারিস্কা ন্যাশনাল পার্ক

রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় আরাবল্লী পাহাড়ের কোলে অবস্থিত সারিস্কা জাতীয় উদ্যান ৮৮১.১১ বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত একটি বিখ্যাত ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র। এই উদ্যানে একাদশ শতকেরও পুরনো গড়রাজা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। উদ্যানে রয়েছে আম, জাম, বহেরা প্রভৃতি গাছেন বন। বন্য জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, বনবেড়াল, হায়না, বন্যশুয়োর, বন্য কুকুর, শজারু, হনুমান। ২০০ রকমের পাখি রয়েছে। সরীসৃপের মধ্যে অজগর ও কোবরা। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় হলো অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। এখানে দর্শনীয় স্থান রয়েছে কঙ্কোয়ারি দুর্গ, সারিস্কা প্যালেস, পাণ্ডুপোল হনুমান মন্দির এবং নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০২

এসো সংস্কৃত শিখি– ১০৪

কিমর্থম্? -- কেন?
আনন্দ: - আনন্দার্থম্ (আনন্দের জন্য)
পঠনম্ - পঠনার্থম্। (পড়ার জন্য)
ভোজনম্ - ভোজনার্থম্।
পূজা - পূজার্থম্।
ভক্তি: - ভক্তর্থম্।
অহং আনন্দার্থং ক্রীডামি।
আমি আনন্দের জন্য খেলা করি।
ভবান্ কিমর্থং ক্রীডতি?
তুমি কেন খেলছ?
অভ্যাসং কুর্ম: --
অহং আনন্দার্থং নৃত্যামি।
অহং জ্ঞানার্থং পঠামি।
সমীর: পঠনার্থং বিদ্যালয়ং গচ্ছতি।
যুবক: ক্রীডার্থং উদ্যানং গচ্ছতি।
ভগিনী পূজার্থং দেবালয়ং গচ্ছতি।
প্রয়োগং কুর্ম: --
নীচের পদ দিয়ে বাক্য রচনা করার চেষ্টা করব।
শিক্ষা, লেখনম্, ধ্যানম্, বিকাশ:, দর্শনম্, সেবা, দানম্, স্নানম্, উপার্জনম্, ধনসংগ্রহ:, মনোরঞ্জনম্।

ভালো কথা

হোলিখেলা

প্রতিবারের মতো এবারও দোলের পরদিন আমরা পাড়ার ছোটোরা সকাল ৮টায় শুভদের বাড়িতে হোলি খেলতে হাজির হলাম। প্রথমে রাধা-মাধবের পূজা হলো। তারপর কীর্তন শুরু হতেই শুভর মা, কাকিমা, জেঠিমা বালতি বালতি রং আমাদের ওপর ছুড়তে লাগলেন। আগে থেকেই দুটো ড্রামে রং গোলা জল রাখা ছিল, আমরাও পিচকারি করে সেই রং ছুড়তে লাগলাম। বড়োরাও সবাই সবাইকে রং দিচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আর কাউকে চেনাই যাচ্ছিল না। দেখতে দেখতে কয়েক ঘণ্টা কোথা থেকে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। তারপর প্রসাদ নিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে এলাম। বাড়িতে এসে স্নানের সময় একটুখানি সাবান লাগাতেই সব রং উঠে গেল। বাবা বললেন, এবার শুভদের বাড়িতে ভেষজ রং এনেছিল। ভেষজ রং খুব সহজেই উঠে যায় আর শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না।

জ্যোতি পাল, ষষ্ঠ শ্রেণী, রানাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রার্থনা

রিদ্ধিমা শাসমল, অষ্টম শ্রেণী,আরামবাগ বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি, আরামবাগ, হুগলী।

সবার ঘরে দেখি আমি
দাদু-দিদান আছে,
আমি কেন হচ্ছি বড়ো
কাজের লোকের কাছে?
ব্যস্ত আমার মা ও বাবা
সকাল থেকে রাতে,
কেউ রাখে না খবর যখন
কষ্ট হয়গো তাতে।

আমি ছোটো, তাই বলে কি
থাকবো একা ঘরে?
বাবা-মায়ের জন্য আমার
কষ্টে হৃদয় ভরে।
একটু আদর ভালোবাসা
চাইছি মাগো আমি
পৃথিবীতে সবার চেয়ে
তুমি যে পরম দামি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

লক্ষ্য মাওমুক্ত ভারত

মাওবাদী দৌরাত্ম্যের তেজ নিভে যাবার মুখে

দুর্গাপদ ঘোষ

পশুপতি থেকে তিরুপতি, এক সময় সশস্ত্র সন্ত্রাস চালাতে থাকা মাওবাদীদের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে দিয়েছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার এবং মাওবাদ প্রভাবিত রাজ্য সরকারগুলোর পদক্ষেপ। একই সঙ্গে ৩ রকমের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে— 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট বা জঙ্গলে জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের মাধ্যমে মাওবাদী দমন; জঙ্গলের গভীরে ঢুকে তাড়া করে গ্রেপ্তার করা, চাপের মুখে ফেলে এবং আকর্ষণীয় পুনর্বাসনের প্যাকেজ ঘোষণা করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য অস্ত্র নামিয়ে আত্মসমর্পণ করানো। সরকারের এই ত্রিমুখী পদক্ষেপের কারণে মাওবাদী হামলার ঘটনা দ্রুতহারে নেমে এসেছে। অনেক বেড়েছে অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণের ঘটনা। ২০২৩ সালে সারা দেশে মোট ৪৮৬টি মাওবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এক বছরের মধ্যে, ২০২৪ সালে তা ১১২টি কমে হয়েছিল ৩৭৪টি। ২০২৫ সালের সরকারি তথ্য এই প্রতিবেদন যন্ত্রস্থ হওয়া পর্যন্ত মেলেনি। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান, এক ধাক্কায় তা প্রায় ৩০০-র মতো কমে একশোর নীচে নেমে গেছে। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সশস্ত্র মাওবাদীদের দৌরাত্ম্য সীমিত করা সম্ভব হয়েছে দেশের মাত্র ৭ জেলার মধ্যে। তার মধ্যে ৪টি হলো ছত্তিশগড়ে। দক্ষিণ বস্তার এলাকার সুকমা, নারায়ণপুর, দান্তেওয়ারা; মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি এবং ওড়িশার কন্ধমল। এই সাত জেলার বাইরে তাদের গতিবিধি থাকলেও নখদন্ত বার করে হামলা চালানোর মতো নয়।

মাওবাদী কমিউনিস্টরা বরাবরই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কথা বলে সহানুভূতি লাভের এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে আসছে। আর তাদের হয়ে যারা যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা চালিয়ে থাকে তারা প্রত্যন্ত এলাকার অতি সাধারণ তথা প্রান্তিক মানুষদের মাওবাদীদের হাতে নিহত হবার ঘটনাকে দেখতে পায় না। আন্তর্জাতিক স্তরেও কিছু তথাকথিত এনজিও আছে যাদের থেকে বা যাদের মাধ্যমে মাওবাদীদের কাছে বিপুল পরিমাণে অর্থ পৌঁছয়। ওইসব

ফঃ ৬

তথাকথিত সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে দেশের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির সম্পর্কের অভিযোগে প্রায়ই শোনা যায়। রাজনৈতিক থেকে ব্যবসায়ী কোনো ক্ষেত্রই বাদ নেই। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের বিরুদ্ধে তো প্রায়ই অভিযোগ উঠে থাকে। সাধারণ মানুষ এবং নিরাপত্তা রক্ষীরা মাওবাদীদের হামলায় নির্মমভাবে নিহত হলেও তারা মুখে 'রা' কাড়ে না। কিন্তু মানুষ এবং সরকারি সম্পত্তি বাঁচাতে রক্ষীরা গুলি চালালে তারা 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' করা হচ্ছে বলে গলাবাজি করতে মাঠে নামে। ১৯৬৭ থেকে ২০০০ এই ৩৩ বছরের কথা বাদ দিলেও এক সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০০০ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত মাওবাদীদের হাতে ৪ হাজার ১১৯ জন সাধারণ ও নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে। ল্যান্ড মাইনস্ এবং আইইডি (ইম্প্রোভাইজড্ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং অ্যাসল্ট কালাসনিকভ (এ কে) রাইফেলের মতো অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে হত্যা করা হয়েছে ২ হাজার ৫১২ জন পুলিশ ও আধা সেনাবাহিনীর জওয়ানদের। অন্যতম উদাহরণ--- ২০১৯ সালে মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলিতে মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে একসঙ্গে ১৯ জন পুলিশ নিহত হয়। ওই হামলার ঘটনার পিছনে মদতদাতা হিসেবে অভিযুক্ত এক ব্যবসায়ী কৈলাস রামচন্দানিকে আটক করা হলে এক বিশেষ গোষ্ঠীর 'বুদ্ধিজীবীরা' হৈচৈ বাধান, আদালতে যান। তদন্তকারীরা জোরের সঙ্গেই জানিয়েছিলেন যে, রামচন্দানির কাছ থেকে নির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে নকসালরা ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আদালত রামচন্দানিকে জামিন না দেওয়ায় তার সমর্থক 'বুদ্ধিজীবীরা' ২০২৪ সালের ৫ মার্চ বম্বে হাইকোর্টে গিয়ে চ্যালেঞ্জ জানায়। এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। অতি সম্প্রতি, গত ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন ছত্তিশগড়ের দু'জায়গায় ১০ কেজি করে মোট ২০ কেজি আইইডি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। যার বিস্ফোরণে অনেক মানুষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা নিয়ে কারও মুখে টুঁ-শব্দটিও শুনতে পাওয়া যায়নি।

সরকারি পরিসংখ্যান মোতাবেক ২০০০ থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমে ৪ হাজার ৮৭৫ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সংখ্যাটা অনুমান করা কঠিন নয় যে তারা কী ধরনের সংঘর্ষ চালিয়ে আসছে। আনুমানিক সংখ্যা ধরলে বিগত ২৫ বছরে ৪ হাজার ৯২৫ জন নকসাল নিহত হয়েছে। তার মধ্যে ২০২৩ থেকে ২০২৬-এর প্রথম মাসের অর্থাৎ ২ বছর ১ মাসের মধ্যে নিহতের সংখ্যা হলো ১ হাজার ২১৪ জন। সবচাইতে বেশি নিহতের ঘটনা ঘটেছে ২০২৩ সালে। সেবছর ৪৮৫ জন নিহত হয়। ২০২৪-এ ২৯৬ এবং ২০২৫ ও ২০২৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৩৩ জন। প্রসঙ্গত ২০২৫ সালের গোড়ায় কেবলমাত্র দান্তেওয়াড়াতেই ২৮৭ জন নকসাল নিহত হয়। ২০২২ সালেও নিহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। সেবছর নিহত হয়েছিল ৪১৩ জন। এবছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের একেবারে শুরুতে ৩ জানুয়ারি ২ জায়গা মিলে ১৮ জনের নিহত হবার খবর পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত সর্বশেষ খবর পর্যন্ত গত ১৯ জানুয়ারি বিজাপুরে ৬ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে।

সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির কারণে একদিকে প্রায় পাইকারি হারে নকসাল জঙ্গিরা নিহত হচ্ছে, পুলিশি অভিযানের ফাঁদে পড়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় গ্রেপ্তার হচ্ছে। অন্যদিকে পুনর্বাসনের সুবিধার প্রতি আকর্ষিত হয়ে দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে। গত ১৪ জানুয়ারিতেও ছত্তিশগড়ের সুকমায় ২৯ জন আত্মসমর্পণ করেছে। এইভাবে দিনে দিনে মাওবাদীদের সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্র কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে নতুন ক্যাডার জোগাড় করা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যেও নানা কারণে সৃষ্টি হচ্ছে হতাশা। সেটা যেমন 'আদর্শগত' কারণে তেমনি কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু সংসার জীবনযাপন না করার মতো নীতিগত কারণেও। ঘর-সংসারহীন জঙ্গলের জীবন এখন অনেকের কাছেই অসহ্য ঠেকেছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্যাডার নিয়োগের গ্রাফ উঁচুতে ছিল। কিন্তু ২০২২ থেকে একেবারে হু হু করে নীচের দিকে নেমে গেছে। উপরন্তু আত্মসমর্পণের গ্রাফ তুঙ্গে উঠেছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২২-২৩ সালে আত্মসমর্পণ করে ১ হাজার ৪৯ জন। গড়ে প্রতি বছর ৫২৫ জন করে। ২০২৪-এ তা বেড়ে হয় ৮৮১ জনে। উপরন্তু সে বছর গ্রেপ্তার করা হয় ১ হাজার ৯০ জনকে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ২ হাজার ২২৫ জন। তাছাড়া ৬৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অতি সম্প্রতি এবছরের ২০ জানুয়ারি ছত্তিশগড়ে ৬ জন মহিলা-সহ ৯ জন এ কে-৪৭ রাইফেল জমা দিয়ে পুলিশের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। গত বছরের ২৮ নভেম্বর নারায়ণপুর থেকে ১৩৫ কিলোমিটার দূরে ছত্তিশগড় পুলিশ এবং ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)-এর যৌথ অভিযানে তছনছ হয়ে যায় ওর্ছা-লঙ্কা-র মাওবাদী ঘাঁটি। গত ১ ডিসেম্বর দান্তেওয়াড়ায় ৫৭ জন আত্মসমর্পণ করে যাদের মধ্যে ২৭ জনের মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ৬৫ লক্ষ টাকা। অনুরূপভাবে ১৭ ডিসেম্বর ১১ জন অস্ত্রসমর্পণ করে মূল স্রোতে ফিরে আসে। যাদের জন্য ৩৭ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত ছিল। এ বছরের ৭ জানুয়ারি মোট ১ কোটি টাকা মাথার দাম ঘোষিত ৬৩ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে ১৮ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে ১৮ জন মহিলা ক্যাডার। তার ঠিক আগের দিন ছত্তিশগড়ের ধামতারি জেলায় ৩৭ বছর বয়সী ভূমিকা ওরফে 'সোমারি' নামের এক মহিলা ক্যাডার আত্মসমর্পণ করে। তার মাথার দাম ঘোষিত ছিল ৫ লক্ষ টাকা। 'গোবরা লোকাল অর্গানাইজেশন স্কোয়াড' সদস্যা এবং সক্রিয় 'এরিয়া কমিটি মেম্বার' হিসেবে বেশ কয়েকটি হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিল এই সোমারি। অস্ত্র নামিয়ে রেখে সোমারি জানিয়েছে যে সরকারের পুনর্বাসন নীতি তাকে আকৃষ্ট করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে টিকতে না পেরে, রণে ভঙ্গ দিয়ে যারা ধরা দিতে বাধ্য হচ্ছে বা যাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তারা 'আত্মসমর্পণকারী'

হিসেবে চিহ্নিত নয়। তারা ধৃত। তাদের সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে না বা হবে না। তাদের যথাযথ বিচার হচ্ছে এবং হবে। কেবল তারাই সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা হামলা তথা সংঘর্ষের মধ্যে না গিয়ে নিজেদের থেকে এগিয়ে এসে অস্ত্র সম্বরণ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অঙ্গীকার করবে। সেই সূত্রে 'ভূ পতি' এবং 'সোমারি'-দের মতো অনেকেই এখন কোনো পদস্থ প্রশাসনিক কর্তা কিংবা মন্ত্রীদের সামনে এসে তা করছে। ক্ষেত্র বিশেষে দলে দলে করছে। অনেকে দলবল সঙ্গে নিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করছে। এরকমই অন্য একজন হলো বিমলা চন্দ্রাসিদাম ওরফে 'তাড়কা'। সে আত্মসমর্পণ করে ২০২৫ সালের ২ জানুয়ারি। গত বছরের ১৪ জুলাইয়ে আত্মসমর্পণ করে আতরাম লাচান্না এবং আতরাম অরুণা। ভূ পতি আত্মসমর্পণ করেছে গত ১৪ অক্টোবর। তার ৩ দিনের মাথায় ১৭ অক্টোবর আত্মসমর্পণ করেছে নকসালদের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য টিভি রাও ওরফে 'রূপেশ'।

গত ১৫ জানুয়ারি বিজাপুর জেলার ২১ জন মহিলা-সহ ৫২ জন নকসাল জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট (এসপি) জিতেন্দ্র কুমার যাদবের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। এ বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এটাই নকসালদের আত্মসমর্পণের বড়ো ঘটনা। এদিন যারা অস্ত্র সমর্পণ করেছে তারা মাওবাদীদের দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটি, অন্ধ্র-ওড়িশা বর্ডার ডিভিশন এবং মহারাষ্ট্রের ভামরাগড় এরিয়া কমিটির অ্যাক্টিভ ক্যাডার ছিল। সম্মিলিতভাবে এদের মাথার দাম ঘোষিত ছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। এসপি আরও জানিয়েছেন যে লাখু করম ওরফে 'অনিল', লক্ষ্মী মাধবী এবং চিন্নি সোধি ওরফে 'শান্তি'— এই ৩ জনের প্রত্যেকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকা। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে এমন ১৩ জন আছে যাদের প্রত্যেকের মাথার জন্য ৫ লক্ষ করে টাকা পুরস্কার ঘোষিত ছিল। বাকীদের মধ্যে ১৯ জনের প্রত্যেকের জন্য ২ লক্ষ এবং ১৪ জনের প্রত্যেকের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল। এই ৫২ জন মাওবাদীই যে কত ভয়ঙ্কর ছিল এ থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। জেলার পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন যে, সরকারের 'পুন মার্গেম' অর্থাৎ সমাজের মূল স্রোতে পুনরাগমন প্রকল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এরা সবাই হিংসার পথ থেকে সরে এসেছে। এরকম ঘটনা ইদানীং অহরহ ঘটে চলেছে।

মাস দুয়েক আগে গত ৭ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের উপস্থিতিতে রাজ্যের বালাঘাটে হাজির হয়ে একসঙ্গে ১০ জন মাওবাদী অস্ত্র নামিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। দুর্ধর্ষ ওইসব মাওবাদী জঙ্গিদের জন্য মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা এই সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের দিন্দোরি এবং মণ্ডলা এলাকা মাওবাদীমুক্ত হয়েছে বলে দাবি করেছেন এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকরা। বাকী রয়েছে আর একটাই জেলা— বালাঘাট। এ বছরের শুরু থেকে ফের সেখানে অভিযান শুরুর জন্য গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। বালাঘাট জেলাকেও মাওবাদী জঙ্গিমুক্ত করা গেলে মধ্যপ্রদেশের মতো বড়ো রাজ্যকে নকসালমুক্ত করা সম্ভব হবে এমনটা রাজ্য প্রশাসনের দাবি। এ বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে যাতে তা করা যায় সেজন্য জোর কদমে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মোহন যাদবের সরকার। নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল এলাকা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারামা রাজু জেলায় এখনো মাওবাদীদের উপস্থিতি থাকলেও বড়ো ধরনের হামলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ২০২৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের এই জেলায় ৭৯ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করার পর মাওবাদীদের এখানে যে শেষ ঘাঁটি ছিল তা বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্র অনুসারে ওড়িশাও দ্রুত মাওবাদী মুক্ত হওয়ার পথে। সে রাজ্যেও অনেকের আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের কন্ধমল জেলা এখনো পুরো মাওবাদীমুক্ত হয়নি। কিন্তু প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় প্রচণ্ড চাপের মুখে রয়েছে তারা। সাড়ে ৪ মাস আগে গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর এই জেলায় রাজ্যে পুলিশ, ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি) এবং সিআর পিএফ-এর যৌথ অভিযানে ওড়িশার এক শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা গণেশের মৃত্যু ঘটে। ওই মাসে আরও ৪ জন মাওবাদী জঙ্গি নিহত হয়। এইসব ঘটনার পর সেখানকার মাওবাদীদের প্রায় কোণঠাসা অবস্থা হয়েছে বলে দাবি করেছেন এই সূত্র।

প্রসঙ্গত, এক সময় অবিভক্ত বিহারে মাওবাদীদের তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু তারপর তাদের একাংশ বুঝতে পারে যে এদেশে 'বন্দুকের নলের মুখ ক্ষমতার উৎস' নয়। এই পথে তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন' সুদূরপরাহত। তখন তারা বন্দুক ছেড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নির্বাচনী রাজনীতিতে আসে এবং 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লিবারেশন' গঠন করে। বিহারে গত বিধানসভা নির্বাচনে এই দলের ২ জন জিতে বিধায়কও হয়েছেন। ২০২৪-এ ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে তাদের দু'জন বিধায়ক জয়ী হয়। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিহারের দু'টি আসন দখল করে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন। আর যারা মাওবাদী চরমপন্থা আঁকড়ে ধরে সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে থেকে গেছে এখন তাদের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন। বর্তমানে নিষিদ্ধ ঘোষিত মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিহারে গঠিত হয়েছিল ২০০৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বরে। তার আগে ১৯৮০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে কে সীতারামাইয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ' (পিডব্লুজি)। তার ১১ বছর আগে ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে গঠিত হয় 'মাওয়িস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার অব ইন্ডিয়া' (এমসিসিআই)। মাওবাদীদের লড়াকু বাহিনী হলো 'পিপলস্ লিবারেশন গেরিলা আর্মি' (পিএলজিএ)। এই বাহিনী উল্লেখিত ৩টি বডি'র নির্দেশে এবং মুখ্য নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে। কিন্তু ঘটনা হলো, এখন থেকে প্রায় ৫৬ বছর আগে যে বিহারে এমসিসিআই গঠিত হয়েছিল এবং এক সময় তাদের দৌরাত্ম্য প্রায় সীমাহীন ছিল এখন সেই বিহারে তা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।□

আমার সঙ্ঘজীবনের ইতিকথা

অবনীভূষণ মণ্ডল

১৯৬৫ সালে ২য় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষাবর্গ হয় বর্ধমান মহন্তস্থলে। ২য় বর্ষে বিশেষ বিষয় ছিল বেত্র-চর্ম ও খড়্গ। বেত্র-চর্মের শিক্ষক ছিলেন শ্যামমোহন দে।

১৯৬৫ সালে বিএসসি পার্ট টু পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর পূর্বেই আড়রা হাইস্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দিই এবং ওই গ্রামে শাখা শুরু করি। বিভিন্ন বৈঠকে কার্যকর্তারা বলতেন সঙ্ঘের কাজ করতে হলে শিক্ষকতার চাকুরি উপযুক্ত। সেই বিবেচনাতেই শিক্ষকতায় যোগদান। আড়রা গ্রামে মনমোহনদার প্রবাস হয়। ওই শাখায় প্রান্ত প্রচারক বসন্তদার প্রবাস হয়। গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ১৯৬৬-তে শ্রীগুরুজী তৃতীয় বার বাঁকুড়ায় আসেন। এবারও বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া মিলে স্বয়ংসেবক সম্মেলন হয় সেই ফুলচাঁদ বাবুর বেড়ে। মুখ্য শিক্ষকের দায়িত্ব ছিল আমার উপর। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রীগুরুজীর সঙ্গে জেলা সঙ্ঘচালক ডাঃ বিজয় কুমার মণ্ডল। এই সম্মেলনে এককগীত পরিবেশন করে ওন্দার স্বয়ংসেবক দুর্গাদাস চক্রবর্তী--- 'জয়তু জয়তু ভারতমহী পুণ্যশালিনী'। এবারও শ্রীগুরুজীর বক্তব্য ছিল এক ঘণ্টার। সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। প্রসঙ্গক্রমে গত বছরের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের বিষয়ে বলেন ওই যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের উচিত ছিল ইছোগিল ক্যানেল পার হয়ে লাহোরের পতন ঘটানো। মাঠের কার্যক্রম শেষ করে বাঁকুড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে চা-চক্রে মিলিত হন। তাতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট রাখহরি চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, আতঙ্কভঞ্জন চৌনী, প্রমোদ মাহাতো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ গোপাল রায় প্রমুখ। ব্যবসায়ী— সুকুমার নন্দী, ভক্তিপদ পাল, শক্তিপদ বরাট, ফটিকচন্দ্র বরাট প্রমুখ এবং শিক্ষক দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

১৯৬৬ সালে তৃতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের জন্য নাগপুরে যাই। তৃতীয় বর্ষও ছিল ৩০ দিনের এবং শুল্ক ৫০ টাকা। বঙ্গপ্রদেশ থেকে আমরা ১৫ জন গিয়েছিলাম ওই সময় গৌরাঙ্গদাও যান। ১৯৬৪ সালে গৌরাঙ্গদা বাঁকুড়া নগর প্রচারক ছিলেন। নন্দলাল সাউ আমাদের দল প্রমুখ শিক্ষার্থী ছিলেন। তৃতীয় বর্ষে বৌদ্ধিক কার্যক্রম হতো দু'বার মহালে (ডাঃ হেডগেওয়ার ভবনের পাশে) আর শারীরিক কার্যক্রম হতো রেশিমবাগ সঙ্ঘস্থানে। থাকার ব্যবস্থা মহালেই মেহতা সায়েন্স কলেজে ও রাষ্ট্রীয় কন্যাশালাতে। এই বর্গের সর্বাধিকারী ছিলেন বচ্ছরাজ ব্যাস। পরবর্তী সময়ে বচ্ছরাজ জনসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সভাপতি হন। বর্গে দীনদয়ালজীর বৌদ্ধিক বিষয় ছিল 'স্বরাজ ও স্বরাজ্য'।

তৃতীয় বর্ষে গিয়ে জানতে পারলাম ১৯৬৫ সালে মকর সংক্রান্তি উৎসবে আসার কথা ছিল হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের রাজা মহেন্দ্রর। সেই অনুযায়ী নাগপুর নগরপালিকা থেকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকারের কোনো ইচ্ছা ছিল না একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো অনুষ্ঠানে অন্য একটি রাষ্ট্রপ্রধান তাতে যোগ দিন। ২ দিন আগে আকাশবাণী থেকে ঘোষণা করা হলো আরএসএস-এর অনুষ্ঠানে নেপালরাজ আসছেন না। এই ঘোষণায় রাজা মহেন্দ্র খুব অস্তস্তিতে পড়েছিলেন এবং না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে একটি লিখিত বার্তা পাঠিয়ে ছিলেন। সেটি মকরসংক্রান্তি উৎসবের দিন পাঠ করে স্বয়ংসেবকদের শোনানো হয়েছিল।

১৯৬৬ সালে নভেম্বর মাসে গোহত্যা বন্ধের দাবিতে দিল্লিতে 'অখিল ভারত গোরক্ষা মহাঅভিযান সমিতি'র ডাকে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয় তাতে লক্ষাধিক মানুষ অংশ নেয়। ওই শোভাযাত্রার উপর ভারত সরকার গুলি চালায়, তাতে কয়েকজন লোক মারা যায়। তখনকার অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ। তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। এর প্রতিবাদে সারা ভারতে অনশন পালন করার ডাক দেওয়া হয়। আমিও পুরুলিয়াতে (তুলিন হাইস্কুলে) শিক্ষকদের মেসে থাকাকালীন অনশন পালন করি। ১৯৬৬ সালে অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ বাবাসাহেব আপ্তের

প্রবাস হয়। ওই সময় গ্রামের সাধারণ লোকদের সঙ্গে তিনি বৈঠকে মিলিত হন। তখন জানা গেল আপ্তেজী রাত্রে ভোজন করেন না। তাঁর সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি কথা গ্রামের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলার আঁধারথোল হাইস্কুলে নিযুক্ত হই। আঁধারথোল স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকতে হতো। শীঘ্রই ওই গ্রামের শাখা শুরু করি। ক্রমে ক্রমে কুমিদ্যা, ধোবার গ্রাম, শ্যামপুর, পুড়ামৌলী, সুনুকপাহাড়ী ও ছেন্দুয়া গ্রামে শাখা শুরু করি। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৪ প্রতি বছরই সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে শিক্ষক হিসাবে যেতে থাকি। আমার বিষয় ছিল 'পদবিন্যাস'। ১৯৬৭ সালে সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ হয় বাঁশদ্রোণীতে। এই শিক্ষা বর্গে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জীর বৌদ্ধিক হয়—সঙ্ঘ কেমন প্রতিষ্ঠান? সঙ্ঘের সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা করা যায় না। সঙ্ঘের তুলনা সঙ্ঘের সঙ্গেই করা যায়। তিনি একটি উদাহরণ দেন। একজন অন্ধকে দুধ কেমন বোঝানোর জন্য বলা হয় দুধ হলো ধবধবে সাদা, কেমন সাদা? অন্ধের প্রশ্নে বলা হয় বকের মতো সাদা। বক কেমন? প্রশ্ন করলে হাত উঠিয়ে কনুই থেকে হাত পর্যন্ত দেখিয়ে বলেন বক হলো এই রকম। অন্ধ তখন নিজের হাত দিয়ে দেখলো এবং বললো 'দুধ হলো বকের মতো বাঁকা।' অর্থাৎ তুলনা করতে গিয়ে কোথায় দাঁড়ালো। দীনদয়ালজী বাঁকুড়াতেও আসেন মফসলে ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে। তিনি বাঁকুড়া নগরে প্রভাত শাখায় হাফপ্যান্ট পরে গিয়েছিলেন।

১৯৬৮ সালে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হয় বর্ধমান মহন্তস্থলে। এই বর্গে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটলো। প্রতি বছরই শিক্ষা বর্গে শ্রীগুরুজী আসতেন। শ্রীগুরুজী ২/৩ বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৈঠকে বসতেন। বৈঠকে শ্রীগুরুজী প্রার্থনার বিষয়ে এবং শারীরিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। একজন শিক্ষার্থীকে প্রার্থনা কণ্ঠস্থ বলতে বললেন, কিন্তু সে প্রার্থনা কণ্ঠস্থ বলতে পারলো না। শ্রীগুরুজী ভীষণ রেগে গেলেন, বললেন—সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে এতদিন হলো এসেছো, এখনো প্রার্থনা কণ্ঠস্থ হয়নি? যাও তোমার জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যাও। সেখানে উপস্থিত কার্যকর্তাদের বললেন 'ওকে আজই বাড়ি পাঠিয়ে দাও'। কার্যকর্তারা একটু অনুনয় বিনয় করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তখন শ্রীগুরুজী আরও রেগে গিয়ে বললেন 'আমি বলছি ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।' ওই কার্যকর্তা সেই শিক্ষার্থীকে নিয়ে সারাদিন প্রার্থনা মুখস্থ করালেন। সন্ধ্যাবেলায় সেই শিক্ষার্থী শ্রীগুরুজীর সামনে কণ্ঠস্থ বলার পর তাকে বাড়ি পাঠানো থেকে বিরত হলেন।

১৯৬৮ সালে প্রান্ত প্রচারক বসন্তদা বাঁকুড়ায় এলে একান্তে আমার সঙ্গে কথা বললেন, 'দেখ অবনী, তুমি শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছ, স্বাভাবিকভাবে বাড়ির বাবা-মা চাইবেন তোমার বিবাহ দিয়ে সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। তুমি কি চাও না কয়েক বছরের জন্য সংঙ্ঘের কাজে পূর্ণ সময় দিয়ে প্রচারক হয়ে সঙ্ঘের কাজের বিস্তার করতে? আমি বললাম আমার ইচ্ছাতো ছিল কিন্তু এখন উপায়? আপনি যদি স্কুলের সম্পাদক ডাঃ বিজয়বাবুকে বলে without pay leave-এর ব্যবস্থা করেন তাহলে হতে পারে। তখন স্কুল কমিটির হাতে এই ধরনের ছুটি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। সেই অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের ২৯/৩০ ডিসেম্বরে বর্ধমানে দক্ষিণ বঙ্গের স্বয়ংসেবকদের সম্মেলন শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে সম্মেলন থেকেই শিলিগুড়ির উদ্দেশে ডাঃ চিন্ময় শীলের সঙ্গে রওনা হই। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের সম্মেলন ছিল। শিলিগুড়ি থেকে আমাকে বালুরঘাট মহকুমা প্রচারক হিসেবে পাঠানো হলো। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কার্যবাহ অধ্যাপক আশিস গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আশিসবাবুর বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। ওই সময় তিওড় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী হিরন্ময়ানন্দ মহারাজ সঙ্ঘের কাজে খুব অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'সঙ্ঘের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য সংগঠন আছে। আমাদের শুধু হিন্দু মিলন মন্দির যুবকদের জন্য।' সেইজন্য যেখানেই হিন্দু মিলন মন্দির, সেখানেই শাখা শুরু করতে হবে। তিওড় আশ্রমে শাখা শুরু হয়। দুইজন বনবাসী ছাত্রকে সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গে পাঠালেন। পাশেই ছিল বিনশিরা গ্রাম। ওখান থেকে স্কুল শিক্ষক নৃপেশচন্দ্র লাহাকে পাওয়া যায়। পরে বিনশিরা গ্রামেও শাখা শুরু হয়। বালুরঘাটে মোক্তার পাড়ায় শাখা ছিল। মালদহ থেকে সুভাষ দাস বিস্তারক হিসেবে এসে ওখানে শাখা শুরু করেন। মোক্তার পাড়া শাখায় আসতো অরুণ মহন্ত, গোবিন্দ ব্যানার্জী, জীবন দত্ত, প্রভাত নন্দী, শ্যামল সরকার, চুড়কা মুর্ম্মু, দুলাল মজুমদার প্রমুখ। চুড়কার বাড়ি ছিল চক রামপ্রসাদ গ্রামে, অরুণের সঙ্গে বিদ্যাচক্র হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়তো। ওই সময় আত্রেয়ী নদীতে বন্যা হওয়ায় বালুরঘাটে আমাদের সেবাকাজ হয়েছিল। সেই সূত্রে নবম শ্রেণীর বইগুলি বন্যাত্রাণের ভাণ্ডার থেকে কিনে দেওয়া হয়। চকরামপ্রসাদ গ্রাম একেবারে পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রাম। পরে চকরামপ্রসাদ গ্রামে সঙ্ঘের শাখা হয়। চুরকা ওই শাখার মুখ্য শিক্ষক হয়। ১৯৭১-এ ভারত-পাক যুদ্ধে সৈনিকদের সাহায্য করতে গিয়ে প্রাণ বলিদান করে। বালুরঘাটের পর প্রাণবন্ত শাখা ছিল পতিরাম। ওই শাখার অভিভাবক ছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ পাল (মাস্টারমশায়)। প্রদীপ সাহা ওই শাখার বালক স্বয়ংসেবক। প্রদীপ বর্তমানে বালুরঘাটে থাকে। এছাড়া বেলতারা, বোল্লা, লক্ষ্মীপুর ও মালঞ্চাতে শাখা শুরু হয়। বালুরঘাট থেকে সাইকেল ট্রিপ করে আমরা হিলিতে যাই। হিলি শহরের রেলস্টেশনটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে। হিলিতে যোগাযোগ হলেও তখন শাখা শুরু করা যায়নি।

বংশীলাল সোনী ছিলেন উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ প্রচারক। বংশীদার ভালো প্রভাব বালুরঘাটে ছিল, তাঁর প্রবাস বালুরঘাটে প্রায়ই হতো, বংশীদা এলে খুবই উৎসাহ পেতাম। ওই সময় মালদহ বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ হয় কলিগ্রামে। ৪৫০ জনের বেশি স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছিল। প্রান্ত প্রচারক বসন্তদার প্রবাস বালুরঘাটে হয়। এছাড়া মালদহ থেকে অহীন্দ্র কুমার দে প্রবাসে আসেন। অহীন্দ্রদা অনেকগুলি গান রচনা করেন এবং সুর আরোপও করেন। তাঁর

লেখা ‘এ ভারত ভূমি পুণ্যতীর্থ....।’ গানটি ওনার মুখ থেকে শুনে আমি অভ্যাস করেছিলাম। বালুরঘাটে পরবর্তী শাখা হয় বিশ্বাস পাড়ায়। ওই শাখায় আসতো জীবন সাহা, রমেশ-সহ আরও বেশ কয়েকজন। বালক স্বয়ংসেবক ঈশ্বর অগ্রওয়ালের নাম আমার খুব মনে আছে। বালুরঘাটে অটলবিহারী বাজপেয়ীজী এসেছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য অটলবিহারীজী ঈশ্বরের বাড়িতে ওঠেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি রাধামোহনবাবু ছিলেন হেডমাস্টারমশায়। তাঁর সঙ্গেও সঙ্ঘের ভালো যোগাযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে রাধামোহনবাবু নগরের সঙ্ঘচালক হন। দুই বছর বালুরঘাটে ছিলাম। ওই সময় শ্রীগুরুজীর সঙ্গে প্রচারকদের বৈঠক হতো। তাতে শ্রীগুরুজীকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঈশ্বরকল্প মানুষের হাত ও পায়ের রং হয় টকটকে লাল। শ্রীগুরুজীরও সেই রকমই লক্ষ্য করেছি।

বৈঠকগুলিতে শ্রীগুরুজী নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কিছু বলতেন না। কিন্তু প্রচারকরা কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর দিতেন। মাঝে মাঝে কিছু বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। আজও সেই নির্মল হাসি খুব মনে পড়ে। একবার একটি বৈঠকে শ্যামলাল ব্যানার্জী প্রশ্ন করেছিলেন—‘গুরুজী, কী বই পড়লে জীবনে উৎসাহ ও প্রেরণা পাব?’ উত্তরে শ্রীগুরুজী বলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী।

দুই বছর পর বাড়ি ফিরে আবার সেই আঁধারথোল স্কুলে নিযুক্ত হই। আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৯৭১ সালে আমার উপর দায়িত্ব পড়লো দক্ষিণ বাঁকুড়া মহকুমা কার্যবাহের। জুলাই মাসে বিএড পড়ার জন্য পুরুলিয়াতে ভর্তি হই এবং পুরুলিয়া নিবাসে থাকতে আরম্ভ করি। ওই সময় পুরুলিয়া জেলা প্রচারক ছিলেন আনন্দময় ভট্টাচার্য। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, বাড়ি রামগড়ে। ১৯৭৩ সালে শ্রীগুরুজীর শেষ প্রবাস হয় পশ্চিমবঙ্গে। জানুয়ারি মাসে দুর্গাপুরে সগড়ভাঙ্গার মাঠে। তিনটি বিভাগের (মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান) স্বয়ংসেবকদের সম্মেলন। ওই সময় শ্রীগুরুজীর একটি কথা আমার খুব মনে আছে। লোকেরা সঙ্ঘকে সি আই এ-র এজেন্ট বলে অপবাদ দেয় কিন্তু সঙ্ঘ কারও তল্পিবাহক বা এজেন্ট নয়। আমি বলছি কংগ্রেস দলের বর্তমান সভাপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা সি আই এ-র এজেন্ট এবং ওখান থেকে তিনি নিয়মিত টাকা পান।

১৯৭৩ সালে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলছিল। হঠাৎ ৫ জুন রাত্রে শ্রীগুরুজীর দেহাবসানের খবর এল। পরদিন সকালে হাইস্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে মৌন শোকমিছিল করে নদী পর্যন্ত যাওয়া হলো এবং ফিরে আসা হলো। সেদিন সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রাখা হলো। ১৯৭৩ সালে আমাকে জেলা কার্যবাহ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শ্রীগুরুজীর মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক নাগপুরে মহাত্মা ফুলে মার্কেটে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও শ্রীগুরুজীর শ্রাদ্ধাদি কার্য তিনি নিজেই মাদ্রাজের ব্রহ্মকপালে সম্পন্ন করেন। এই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য জেলা থেকে আমাকে পাঠানো হয়। এই বৈঠকে মাননীয় বালাসাহেব দেওরস ওরফে মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরসকে সরসঙ্ঘচালক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উল্লেখ, শ্রীগুরুজী তার দেহাবসানের প্রায় দু’ মাস আগেই একটি চিঠিতে বালাসাহেবজীকে তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক হিসেবে নিযুক্তির কথা লিপিবদ্ধ করে যান। শ্রীগুরুজীর লিখিত চিঠি অনুসারে মাননীয় বালা সাহেবজীকে পরবর্তী সরসঙ্ঘচালক ঘোষণা করার পর বালাসাহেব জী সকলের সমানে বিনীতভাবে জানান, ‘‘পূর্ববর্তী সরসঙ্ঘচালকদ্বয় একজন ছিলেন রাষ্ট্রদ্রষ্টা ও অন্যজন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সেইজন্য তাদের নামের আগে পরমপূজনীয় শব্দ দুটি যথাযথ কিন্তু আমার নামের আগে যেন ওই শব্দদুটি ব্যবহার না করা হয়।’’ তখন উপস্থিত অধিকারীগণ ঠিক করলেন ব্যক্তির নামের পূর্বে নয় কিন্তু ‘সরসঙ্ঘচালক’ পদের আগে ওই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ বলা হবে ‘পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক’ বালাসাহেব দেওরস। ওখানে গিয়ে জানা গেল শ্রীগুরুজী সরসঙ্ঘচালক নিযুক্তির পত্র ছাড়া আরও দুটি পত্র লিখেছিলেন। তালডাংরায় বিস্তারক এসেছিলেন মেদিনীপুর থেকে ভূপেন বেরা। তিনি রান্না করে খেতেন। আমি প্রায়ই তালডাংরা প্রবাসে যেতাম। প্রতি শনি-রবিবার আমার প্রবাস থাকতো দক্ষিণ বাঁকুড়ায়। শনিবার ক্লাস শেষ করেই বাসে উঠে পড়তাম। খাতড়া, রানিবাঁধ, মণ্ডলকুলি শাখাগুলিতে যেতাম।

১৯৭৫ এর ২৫ জুন অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের গ্রেপ্তার করে জেলের মধ্যে ভরে দেওয়া হলো। জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও জেলে ভরা হলো।

পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হলো। আমরা খবর পাওয়ার পর থেকে আত্মগোপন করা শুরু করলাম। পুলিশ গিয়ে সঙ্ঘকার্যালয় সিল করে দিল। আমাদের কার্যকর্তাদের নাম বদল করে দেওয়া হলো। প্রচারকরা ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। ধুতি পরিহিত প্রচারকরা প্যান্ট-শার্ট পরতে লাগলেন। একটি ব্যাগ হাতে যাতে কোনো কোম্পানির ছাপ দেওয়া থাকে সেই কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিতে লাগলেন। তখন বাঁকুড়া জেলা প্রচারক ছিলেন মহারাষ্ট্রের দামোদর সারলকর। নগর প্রচারক ছিলেন মেদিনীপুরের তপন ঘোড়ুই। পুলিশ গিয়ে নিবাস সিল করে দেয়। লোহার খড়্গ, বাদ্য যন্ত্র (ড্রাম, বিউগল, সায়-ড্রাম) ও অনেক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়, যেগুলো নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরও ফেরত পাওয়া যায়নি। সেই সময় সংবাদপত্র সেন্সর করা হয়। সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে খবর ছাপতে হতো। সরকারের সমালোচনা বা আলোচনা কোনো কিছুই ছাপা যাবে না। সরকারি দমনপীড়ন চলতে লাগলো। অফিসে দেরি করে হাজির হলে তার লাল দাগ পড়ে যেতো। ট্রেন সময়মত না চললে ড্রাইভারের শাস্তি হতো। এই সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে জনসাধারণের মন জয় করার চেষ্টা হতো। সেই জন্য আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে গোপনে সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হতো; সেগুলো ব্যক্তি মারফত জেলায় জেলায় গিয়ে পৌঁছে দিতাম। এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী, তারজন্য প্রত্যন্ত গ্রামের শাখায় বৈঠকে বসতাম। পরবর্তী বৈঠক কবে, কোথায় হবে সেই সূচনা দিয়ে দেওয়া হতো। (ক্রমশ)

মমতার 'দুধেল গাই'দের আস্ফালনে কি এবার হিন্দুদের বারোটা বাজবে?

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অঙ্গনে আজ শাসকদলের যে নির্লজ্জ আস্ফালন আমরা দেখছি, তা কেবল রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অস্তিত্বের মূলে এক কুঠারাঘাত। একজন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীও বটে, তিনি যখন প্রকাশ্য জনসভা থেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উসকানি দিয়ে বলেন 'আমরা আছি' বলে আপনারা ভালো আছেন..., একটা কমিউনিটি যখন জোট বেঁধে, ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম বারোটা বাজিয়ে, তখন বুঝতে হবে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা আজ কোন তলানিতে এসে ঠেকেছে। এটি কোনো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রশাসনিক প্রধানের ভাষা হতে পারেনা। এটি তৃণমূলনেত্রীর একটি বিশেষ 'দুধেল গাই' গোষ্ঠীর মব-তন্ত্রকে ব্যবহার করে সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজকে ভয় দেখানোর কৌশল। উনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে বেশি মব লিডার হয়ে গেছেন যে নিজের পোষিত মব কে দিয়ে সাধারণ বাঙালির বারোটা বাজাতে ব্যস্ত।

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক চরম অরাজকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর মতো একটি সম্পূর্ণ সাংবিধানিক এবং নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে শাসকদল যে রণকৌশল নিয়েছে, তা নজিরবিহীন। ভারতের অন্য ১১টি রাজ্যে যখন এই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে কেন এত আপত্তি? আদালত থেকে রাজপথ; সর্বত্রই এই প্রক্রিয়াকে আটকানোর মরিয়া চেষ্টা চলছে। ধর্মতলার মতো ব্যস্ততম মোড়ে ধরণা দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে, এমনকি জীবনদায়ী অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে এই আন্দোলনের আড়ালে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে ভয় পাচ্ছে শাসকদল।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, পশ্চিমবঙ্গের সেই 'নো-গো জোন'গুলো, যেখানে প্রশাসনের বদলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের পেশ পেশিশক্তির শাসন চলে। মুর্শিদাবাদে গত পয়লা বৈশাখের আগে যেভাবে হিন্দু দোকানপাট আর বাড়িঘর চিহ্নিত করে পুড়িয়ে দেওয়ার নীলনকশা তৈরি হয়েছিল এবং পরে তদন্তে শাসকদলের যোগসূত্র সামনে এসেছে, তা প্রমাণ করে যে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প কতটা গভীরে ছড়িয়েছে। বেলডাঙ্গার কার্তিকপূজার প্যান্ডালে আগুন এবং দাঙ্গা বা মা কালীর প্রতিমার মাথা কেটে নেওয়ার মতো ঘটনা যখন ঘটে এবং পুলিশ সেই ভাঙা মূর্তি অবমাননাকরভাবে ভ্যানে করে তুলে নিয়ে যায়, তখন হিন্দুর চিরন্তন ধর্মীয় আবেগ ভূলুণ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী যখন ধরণা মঞ্চ থেকে 'ঘিরে ফেললে বারোটা বাজিয়ে দেবে' বলেন, তখন আসলে সেই সমস্ত অসামাজিক জেহাদি শক্তিকেই পরোক্ষ বার্তা দেওয়া হয় যে, 'তোমরাই আমাদের শক্তির উৎস, তোমরা যা খুশি তাই করতে পারো।' আগামীদিনে যদি এরকম কিছু হয় তাহলে এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, একটি সুনিয়োজিত ঘটনা মনে করতে হবে। যার ঘোষণা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী ধর্মতলা থেকে করলেন।

২০২১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী ভয়াবহ হিংসার স্মৃতি হিন্দুরা আজও ভোলেনি। শুধু বিজেপি সমর্থক নয়, সাধারণ তৃণমূল কর্মী বা বামপন্থী হিন্দুদেরও দোকানপাট লুঠ হয়েছিল, আক্রান্ত হয়েছিল ভিটেমাটি। আজ যখন পশ্চিমবঙ্গের আপামর মানুষ 'পালটানো দরকার' বলে আওয়াজ তুলছেন, তখন এই ধরনের হুমকি সরাসরি সেই গণতান্ত্রিক মানসিকতাকে দমন করার চেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আজ পুলিশমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন না করে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সাধারণ হিন্দু সমাজকে আজ ভাবতে হবে, এই তোষণের রাজনীতি যদি চলতে থাকে, তবে আগামী দিনে কি আমাদের সন্তানদের জন্য এক নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গ রেখে যেতে পারব? যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিশেষ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীবদ্ধ আক্রমণের ভয় দেখান, তাঁর হাতে পশ্চিমবঙ্গের সংবিধানিক অধিকার আর মানুষের জীবন নিরাপদ থাকতে পারে না। আজ হিন্দুর আত্মপরিচয় ও অস্তিত্বরক্ষার লড়াই শুরু করার সময় এসেছে। □

শোক সংবাদ

বর্ধমান টাউনহল সংলগ্ন গুরু গোবিন্দ সিংহ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক অজয় কোনার (বরিষ্ঠ সঙ্ঘ প্রচারক হরিসাধন কোনারের কনিষ্ঠা ভ্রাতা) গত ৮ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। অকৃতদার শ্রীকোনার দীর্ঘদিন ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(৬৬)

গল্পকথায় ডাক্তারজী

লোক সংগ্রহ

সংগঠন মানে সম্পর্ক, সম্পর্কে আত্মীয়তা, আত্মীয়তা গড়ে স্বার্থত্যাগ— আত্মবোধের বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এই তত্ত্বকে ডাক্তারজী সমস্ত জীবন জুড়ে নানা ব্যবহারিক উদাহরণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনি তো প্রভাত থেকে প্রদোষকাল পর্যন্ত ভ্রমণ, সন্ধ্যান্তে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বৈঠক, আলোচনা, গল্প ইত্যাদি ছিল তাঁর নিত্য দিনের কাজ। সাধারণ অসুস্থতা এর জন্য কোনো বাধা হতে পারেনি। অসুস্থ ডাক্তারজী চা তাঁর খুব পছন্দ ছিল না। কিন্তু সকাল থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আপ্যায়নে যে কত কাপ চা খেতে হতো তার হিসেব থাকতো না। তিনি বলতেন— এই চায়ের পেছনে যে আত্মীয়তার মনোভাব তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এই আত্মীয়তাকে ভিত্তি করেই ডাক্তারজী সকলকে সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম করে তুলতেন। কিন্তু এর জন্য তাকে নিজের শরীরকে অনেক কষ্ট দিতে হতো। তাঁর ভ্রমণকালের একটি ঘটনা। মুক্তাপুরের এক তরুণ স্বয়ংসেবক ডাক্তারজীকে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ করেন। ডাক্তারজী সহসা আসেন না তাই সেই স্বয়ংসেবক আগ্রহ ভরে তাঁর জন্য পুরি ও শ্রীখণ্ড (মহারাষ্ট্রের অত্যন্ত উপাদেয় একটি মিষ্টি খাবার) তৈরি করেন এবং একটি থালায় ডাক্তারজীকে পরিবেশন করেন।

এই দৃশ্য দেখে সেখানকার সঙ্ঘচালক শ্রীভাউসাহেব ঘাটে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে সেই স্বয়ংসেবককে বললেন— তুমি ডাক্তারজীর অসুস্থতার কথা জানো তবু শ্রীখণ্ড কেন তৈরি করালে? সে স্বয়ংসেবক খুব ঘাবড়ে গেল। ডাক্তারজী সঙ্গে সঙ্গে হেসে তাকে বললেন— 'না না, শ্রীখণ্ড আমার খুব ভালো লাগে, এতে আমার ক্ষতি হবে না, আমি খাব'। এক তরুণ কার্যকর্তার মনে কষ্ট না হয় তার জন্য সানন্দে সব খাবার তিনি গ্রহণ করলেন। পরের কার্যক্রমে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কাউকে তিনি কিছু বুঝতে দেননি। এর মধ্যে আপ্পাজী জোশীকে পত্রে জানান— 'রোজই জ্বর হয়, মাথাব্যথা করে, খুব দুর্বলতা বোধ হয়।' বিন্দু বিন্দু শরীরের রক্তকে জল করে তিনি লোক সংগ্রহ করেছেন আর তার প্রেরণা দিয়েছেন। তার জন্যই সঙ্ঘের মতো এই বিশাল সংগঠন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

ডাক্তারজীর আর একটি দিক ছিল সহজতা, সরলতা। ছিল একটি নির্মল নিরহঙ্কারী মন। সাধারণ স্বয়ংসেবকের মতোই সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতেন। সরসঙ্ঘচালক পদ এ বিষয়ে কোনোদিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়নি। কেউ কোনো কাজ দিলে সঙ্গে সঙ্গে করে দিতেন। একবার অকোলায় গেলে ফেরার সময় সেখানকার কার্যকর্তারা এক অনাথ মহিলাকে ট্রেনে বসিয়ে তাকে বোম্বাই শ্রদ্ধানন্দ অনাথ মহিলাশ্রমে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করেন। বোম্বাই পৌঁছাবার পর ডাক্তারজী তাকে অনাথ আশ্রমে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। এমন ভ্রমণকালে এমন অনেক ঘনিষ্ঠ জনই তাকে নানা ফাইফরমাস করতেন আর তা তিনি সহজ ভাবে করেও দিতেন। জনৈক স্বয়ংসেবকের 'ঘি'-এর বয়ামও এরকম একবার বোম্বাই পৌঁছে দিয়েছেন। নিস্পৃহতা, নিরহঙ্কার, সমভাব, লোক সংগ্রহের আরেকটি মূল মন্ত্র। ডাক্তারজী আপন কর্মের মধ্যে দিয়ে সকলকে তা শিখিয়েছেন।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস